



বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলের প্রাতিষ্ঠানিক সুশাসন

মূল প্রতিবেদন

১ নভেম্বর, ২০২৬

বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলের প্রাতিষ্ঠানিক সুশাসন

গবেষণা উপদেষ্টা

ড. ইফতেখারুজ্জামান, নির্বাহী পরিচালক, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)

অধ্যাপক ড. সুমাইয়া খায়ের, উপদেষ্টা, নির্বাহী ব্যবস্থাপনা, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)

মুহাম্মদ বদিউজ্জামান, পরিচালক, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)

গবেষণা পরিচালনা

কাওসার আহমেদ, রিসার্চ অ্যাসোসিয়েট, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি, টিআইবি

কাজী আমিনুল হাসান, রিসার্চ অ্যাসোসিয়েট, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি, টিআইবি

মো. জুলকারনাইন, সিনিয়র রিসার্চ ফেলো-কোয়ালিটিটিভ, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি, টিআইবি

গবেষণা সহকারী

সাদিয় আফরিন কণা, গবেষণা সহকারী, টিআইবি

ফাতিমা তানজিম, গবেষণা সহকারী, টিআইবি

কৃতজ্ঞতা প্রকাশ

এই গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত রাজনৈতিক দলের নেতা-কর্মী, নির্বাচন কমিশনের কর্মকর্তা, রাজনৈতিক বিশ্লেষক, শিক্ষক ও গবেষক যারা তাঁদের মূল্যবান মতামত, অভিজ্ঞতা ও বিভিন্ন বিষয়ে তথ্য ও পর্যবেক্ষণ তুলে ধরে এই গবেষণা প্রতিবেদনকে সমৃদ্ধ করতে সহায়তা করেছেন, তাঁদের সকলের প্রতি আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। এই গবেষণার মানোন্নয়নের জন্য নিয়মিতভাবে তথ্য প্রদান, বিভিন্ন সময়ে মূল্যবান মতামত ও সহযোগিতার জন্য রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি বিভাগের সকল সহকর্মীর প্রতি অসীম কৃতজ্ঞতা। গবেষণায় মাঠপর্যায়ে তথ্য সংগ্রহে সহায়তা করে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন টিআইবির সংশ্লিষ্ট সচেতন নাগরিক কমিটি (সনাক) কার্যালয়ের এরিয়া কোঅর্ডিনেটরসহ অন্যান্য সহকর্মীগণ এবং সনাক সদস্যগণ। গবেষণায় তথ্য সংগ্রহ ও প্রতিবেদনের ফলাফল উপস্থাপনায় মতামত ও কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য প্রদানের জন্য আউটরিচ অ্যান্ড কমিউনিকেশন বিভাগের পরিচালক মোহাম্মদ তোহিদুল ইসলাম এবং অন্যান্য সহকর্মীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। গবেষণা পরিচালনায় সার্বিক পরামর্শ ও দিকনির্দেশনা প্রদান এবং প্রতিবেদন পর্যালোচনা করেছেন রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি বিভাগের পরিচালক মুহাম্মদ বদিউজ্জামান। সবশেষে গবেষণায় গুরুত্বপূর্ণ দিকনির্দেশনা, মতামত ও তথ্য প্রদানের জন্য টিআইবির উপদেষ্টা, নির্বাহী ব্যবস্থাপনা, অধ্যাপক ড. সুমাইয়া খায়ের এবং নির্বাহী পরিচালক ড. ইফতেখারুজ্জামানের প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞতা।

প্রকাশ

১ নভেম্বর ২০২৬

যোগাযোগ

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

মাইডাস সেন্টার (চতুর্থ ও পঞ্চম তলা)

বাড়ি # ৫, সড়ক # ১৬ (নতুন) (পুরানো ২৭) ধানমন্ডি, ঢাকা ১২০৯

ফোন: (+৮৮০-২) ৪১০২১২৬৭-৭০

ফ্যাক্স: (+৮৮০-২) ৪১০২১২৭২;

ই-মেইল: info@ti-bangladesh.org

ওয়েবসাইট: <https://www.ti-bangladesh.org>

সূচিপত্র

মুখবন্ধ	i
অধ্যায় ১: ভূমিকা	১
গবেষণার প্রেক্ষাপট	১
গবেষণার যৌক্তিকতা	২
গবেষণার উদ্দেশ্য	২
গবেষণার পরিধি	৩
গবেষণার পদ্ধতি	৩
তথ্যের উৎস ও সংগ্রহ	৩
নমুনায়ন পদ্ধতি	৩
বিশ্লেষণ কাঠামো	৪
অধ্যায় ২: রাজনৈতিক দলীয় ব্যবস্থা ও গণতন্ত্র	৬
রাজনৈতিক দল, গণতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা	৬
রাজনৈতিক উন্নয়ন ও রাজনৈতিক সংস্কৃতি	৭
বাংলাদেশের রাজনৈতিক উন্নয়ন, রাজনৈতিক সংস্কৃতি ও দলীয় রাজনীতি	৮
বাংলাদেশে রাজনৈতিক বন্দোবস্ত ও দলীয় শাসনের রূপান্তর	৯
রাজনৈতিক দল, অভ্যন্তরীণ গণতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক সংহতকরণ	১১
অধ্যায় ৩: বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলসমূহ	১৪
অধ্যায় ৪: রাজনৈতিক দলের প্রাতিষ্ঠানিক সুশাসন	১৬
রাজনৈতিক দল গঠন ও পরিচালনাসংশ্লিষ্ট আইনি কাঠামো	১৬
রাজনৈতিক দলের নিবন্ধন গ্রহণে আইনি চ্যালেঞ্জ	১৬
রাজনৈতিক দলের নিবন্ধন গ্রহণে আর্থিক চ্যালেঞ্জ	১৭
রাজনৈতিক দল নিবন্ধনের শর্ত সম্পর্কিত বৈশ্বিক/আন্তর্জাতিক চর্চা	১৯
রাজনৈতিক দলের নিবন্ধন প্রক্রিয়া সংক্রান্ত আইনি সীমাবদ্ধতা	২০
রাজনৈতিক দলের নিবন্ধন প্রক্রিয়ায় অনিয়ম ও রাজনৈতিক প্রভাব	২০
রাজনৈতিক অর্থায়নে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিতকরণ সংক্রান্ত আইনি সীমাবদ্ধতা	২১
রাষ্ট্রীয় আইনের পরিপালন	২২
রাজনৈতিক দলের গঠনতন্ত্র সংরক্ষণ	২২
রাজনৈতিক দলের গঠনতন্ত্রে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের সাথে সাংঘর্ষিক বিধানের উপস্থিতি	২২
রাজনৈতিক দলের সহযোগী বা অঙ্গ সংগঠন এবং বিদেশে সংগঠন বা শাখা পরিচালনা	২৬
অভ্যন্তরীণ গণতন্ত্র চর্চা	২৬
দলীয় প্রধান নির্বাচন প্রক্রিয়া: গঠনতন্ত্র অনুসরণ ও বাস্তব চর্চা	২৬
রাজনৈতিক দলে পরিবার-কেন্দ্রিক নেতৃত্ব নির্বাচনের চর্চা	২৮
বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রধানের নেতৃত্ব প্রদানের সময়কাল	২৮
রাজনৈতিক দলসমূহের কেন্দ্রীয় কমিটি গঠন	৩০
রাজনৈতিক দলসমূহের স্থানীয় কমিটি গঠন	৩১

রাজনৈতিক দলসমূহের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া	৩১
নির্বাচনে প্রার্থী মনোনয়ন প্রক্রিয়া	৩২
অংশগ্রহণ ও অন্তর্ভুক্তি	৩৩
দলের কেন্দ্রীয় কমিটিতে নারী সদস্যদের অন্তর্ভুক্তি	৩৩
নির্বাচনে নারী প্রার্থী মনোনয়ন	৩৪
জবাবদিহি ব্যবস্থা	৩৫
দলীয় শৃঙ্খলা ব্যবস্থা	৩৬
তথ্য প্রকাশ	৩৯
রাজনৈতিক দলের প্রাতিষ্ঠানিক স্বচ্ছতা ও তথ্য প্রকাশে ঘাটতি	৩৯
রাজনৈতিক দলের আর্থিক ব্যবস্থাপনা	৪১
দলীয় আর্থিক নীতি ও কার্যপ্রণালী বিধি	৪১
আয়ের ঘোষিত উৎস ও ব্যয়ের খাত	৪২
হিসাব সংরক্ষণ ও আর্থিক প্রতিবেদন প্রণয়ন	৪২
রাজনৈতিক দলসমূহের আর্থিক প্রতিবেদন প্রণয়নে অনিয়ম	৪৩
রাজনৈতিক দলগুলোর প্রাক্কলিত বাৎসরিক ব্যয়	৪৩
রাজনৈতিক দলসমূহের প্রাক্কলিত আয়	৪৫
রাজনৈতিক দলসমূহের অর্থ সংগ্রহ প্রক্রিয়া	৪৭
অনিয়ম-দুর্নীতি	৪৭
রাজনৈতিক দুর্ভ্রাত্তয়ন ও অপরাধের রাজনীতিকরণ	৪৭
অধ্যায় ৫: উপসংহার	৪৯
সার্বিক পর্যবেক্ষণ	৪৯
সুপারিশ	৪৯
সংযুক্তি ১: তথ্যসূত্র	৫১

মুখবন্ধ

গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থাকে সুসংহত ও কার্যকর করতে এবং রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে গণতন্ত্রের কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান হলো রাজনৈতিক দল। নাগরিকদের রাজনৈতিক আকাঙ্ক্ষা ও মতামতকে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে তুলে ধরা, জনগণকে সংগঠিত ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে সক্রিয় করা, নেতৃত্ব তৈরি ও জনপ্রতিনিধি নির্বাচন করা এবং রাষ্ট্রীয় নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে ভূমিকা রাখার মাধ্যমে রাজনৈতিক দল নাগরিক ও রাষ্ট্রের মধ্যে সেতুবন্ধনের ভূমিকা পালন করে। একটি বহুত্ববাদী রাজনৈতিক পরিবেশ ও গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় রাজনৈতিক দলসমূহ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। রাজনৈতিক দল গণতন্ত্রের কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান হওয়ায় দলের অভ্যন্তরীণ সুশাসন প্রতিষ্ঠা তথা গণতন্ত্র, স্বচ্ছতা, জবাবদিহি ও শুদ্ধাচার চর্চা দেশের বৃহত্তর গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি বিকশিত করতে অনুঘটক হিসেবে কাজ করে।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম, ভাষার অধিকার, গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠাসহ রাজনৈতিক অধিকারভিত্তিক বিভিন্ন আন্দোলনে রাজনৈতিক দলসমূহ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। তবে একই সাথে রাজনৈতিক দলসমূহের মধ্যে অভ্যন্তরীণ গণতন্ত্র চর্চা, আয়-ব্যয়ে স্বচ্ছতার ঘাটতি, রাজনৈতিক সহিংসতা, অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড, ও জবাবদিহির ঘাটতিসহ বিভিন্ন বিষয় পরিলক্ষিত হয়। বিভিন্ন সময়ে সামরিক শাসনের উত্থান ও কর্তৃত্ববাদী শাসনব্যবস্থা কায়েমের ফলে রাজনৈতিক দলসমূহের বিকাশ এবং রাজনৈতিক অধিকার ও চর্চা বারবার বাধাগ্রস্ত হয়। সুশাসন, কার্যকর সংসদ প্রতিষ্ঠা, নির্বাচন ব্যবস্থা, রাজনৈতিক অর্থায়নে স্বচ্ছতা, নির্বাচনী ইশতেহারে সুশাসন ও শুদ্ধাচার ইত্যাদি বিষয়ে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) নিয়মিতভাবে গবেষণা ও অধিপরামর্শ কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। যার ধারাবাহিকতায় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে রাষ্ট্র কাঠামোতে স্বচ্ছতা, জবাবদিহি, ন্যায়বিচার, দুর্নীতি প্রতিরোধ তথা সার্বিক সুশাসন প্রতিষ্ঠায় রাজনৈতিক দলসমূহের গুরুত্ব বিবেচনায় বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলসমূহের প্রাতিষ্ঠানিক সুশাসনের চ্যালেঞ্জ পর্যালোচনা করার উদ্দেশ্যে এই গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়।

এই গবেষণা ফলাফলে দেখা যায় যে, রাজনৈতিক দলগুলোর প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রমে সুশাসনের প্রতিটি নির্দেশকে তথা স্বচ্ছতা, জবাবদিহি, গণতান্ত্রিক চর্চা, অংশগ্রহণ ও অন্তর্ভুক্তি, অনিয়ম-দুর্নীতি প্রতিরোধে ব্যাপক ঘাটতি বিদ্যমান। রাজনৈতিক দলগুলোর অভ্যন্তরীণ গণতান্ত্রিক চর্চা, রাজনৈতিক অর্থায়নে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিসহ সুশাসন নিশ্চিতকরণে একটি শক্তিশালী আইনি কাঠামোর ঘাটতি রয়েছে। রাজনৈতিক দলগুলোর জন্য বিদ্যমান বিধি-বিধান আন্তর্জাতিক উত্তম চর্চার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। রাজনৈতিক দলের নিবন্ধনের আইনি শর্তভিত্তিক যে ব্যবস্থাটি রয়েছে তা প্রতিযোগিতামূলক পৃষ্ঠপোষকতা (কম্পিটেটিভ ক্লায়েন্টিলিজম) তৈরি করে, যা দলগুলোকে ব্যবসায়ী ও বিভ্রাটবাদের পৃষ্ঠপোষকতার মাধ্যমে নিজেদের কার্যক্রম পরিচালনা করতে বাধ্য করে। অপরদিকে, রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে সংশ্লিষ্ট আইন, বিধি-বিধান ও দলীয় গঠনতন্ত্র পরিপালন না করা বা ক্ষেত্রবিশেষে নামমাত্র বা প্রতীকী অর্থে পরিপালন করার প্রবণতা লক্ষ করা গেছে। বিদ্যমান রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে দলগুলোর কার্যক্রম পরিচালনায় বিপুল পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন হয়; সেই অর্থের ব্যবস্থাপনায় সম্পূর্ণরূপে অনানুষ্ঠানিক ও অস্বচ্ছ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সম্পাদিত হয়। রাজনৈতিক দলগুলোর আনুষ্ঠানিকভাবে প্রদত্ত আয়-ব্যয়ের হিসাব ও গবেষণায় প্রাক্কলিত আয়-ব্যয়ের মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য লক্ষ করা যায়। রাজনৈতিক অর্থায়নে ব্যবসা ও ব্যক্তিগত উন্নয়ন এবং অনানুষ্ঠানিক খাত বা উৎসের প্রাধান্য দলগুলোতে ব্যক্তি ও পরিবারকেন্দ্রিক নেতৃত্ব তৈরিতে সহায়তা করেছে। একইসাথে রাজনৈতিক দলে বিশেষত বিভিন্ন সময়ে ক্ষমতায় থাকা বা ক্ষমতার কাছাকাছি থাকা দলগুলোতে কালো টাকা, ব্যবসায়িক স্বার্থ ও অপরাধী চক্রের প্রভাব এবং রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়নকে উৎসাহিত করেছে এবং যা প্রভাবশালী রাজনৈতিক দলগুলোকে ব্যবসায়ী ও অপরাধী চক্রের অর্থ বা মুনাফা অর্জনের বাণিজ্যিক মডেলে পরিণত করেছে। দলীয় কার্যক্রমে গণতান্ত্রিক চর্চা, অংশগ্রহণ এবং অন্তর্ভুক্তির ঘাটতির ফলে দলগুলোর মধ্যে এক ব্যক্তি কেন্দ্রিক নেতৃত্ব, পরিবারতন্ত্র, কর্তৃত্বপরায়ণতা, অভিজাততন্ত্র, গরিষ্ঠতন্ত্র ও পুরুষতান্ত্রিক সংস্কৃতি সৃষ্টি হয়েছে। রাজনৈতিক দলগুলোর বিভিন্ন পর্যায়ে ও কর্মকাণ্ডে নারীদের অংশগ্রহণ সীমিত ও অনেকক্ষেত্রেই প্রতীকী। দলীয় কার্যক্রমে অনিয়ম-দুর্নীতি প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা না থাকায় এবং জবাবদিহি ব্যবস্থার ঘাটতির ফলে দলগুলোকে বিশেষ করে বৃহৎ রাজনৈতিক দলগুলোকে অর্থ ও পেশী শক্তির ব্যবহার, রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন ও রাজনৈতিক সহিংসতার দিকে ধাবিত করেছে। দলগুলোর প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রমে সুশাসন নিশ্চিত করতে অভ্যন্তরীণ সংস্কার অপরিহার্য এবং এই সংস্কারের দায়-দায়িত্ব দলগুলোকে নিজেদেরই নিতে হবে।

গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত রাজনৈতিক দলের নেতা-কর্মী, নির্বাচন কমিশনের কর্মকর্তা, রাজনৈতিক বিশ্লেষক, শিক্ষক ও গবেষক যারা তাঁদের মূল্যবান মতামত, অভিজ্ঞতা ও বিভিন্ন বিষয়ে তথ্য ও পর্যবেক্ষণ তুলে ধরে এই গবেষণা প্রতিবেদনকে সমৃদ্ধ করতে সহায়তা করেছেন, তাঁদের সকলের প্রতি আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। গবেষণাটি সম্পন্ন করেছেন টিআইবির গবেষক কাওসার আহমেদ, কাজী আমিনুল হাসান এবং মো. জুলকারনাইন। গবেষণা সহকারী হিসেবে ছিলেন সাদিয়া আফরিন কণা ও ফাতিমা তানজিম। মাঠপর্যায়ে তথ্য সংগ্রহে সহায়তা করে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন টিআইবির সংশ্লিষ্ট সচেতন নাগরিক কমিটি (সনাক) কার্যালয়ের এরিয়া কোঅর্ডিনেটরসহ অন্যান্য সহকর্মী এবং সনাক সদস্যগণ। টিআইবির উপদেষ্টা, নির্বাহী ব্যবস্থাপনা, অধ্যাপক ড. সুমাইয়া খায়ের এবং গবেষণা ও পলিসি বিভাগের পরিচালক মুহাম্মদ বদিউজ্জামান এই গবেষণা কার্যক্রমের উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। তথ্য সংগ্রহ, প্রাসঙ্গিক তথ্য প্রদান, বিশ্লেষণ ও প্রতিবেদন প্রণয়নে সহায়তা ও গুরুত্বপূর্ণ মতামত প্রদানের জন্য গবেষণা ও পলিসি এবং আউটরিচ অ্যান্ড কমিউনিকেশন বিভাগসহ সকল সহকর্মীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই।

এই গবেষণার ফলাফল ও সুপারিশের আলোকে রাজনৈতিক দল, সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান এবং নীতি-নির্ধারণী পর্যায়সহ সকল অংশীজন কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করলে আমাদের প্রচেষ্টা সার্থক হবে। এবিষয়ে পাঠকের পরামর্শ সাদরে গৃহীত হবে।

ইফতেখারুজ্জামান

নির্বাহী পরিচালক

গবেষণার প্রেক্ষাপট

আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় রাজনৈতিক সংগঠনের বিকাশ ও রাজনৈতিক বহুত্ববাদের চর্চা ও সমুন্নত রাখার ক্ষেত্রে রাজনৈতিক দলসমূহ প্রধান মাধ্যম হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। রাজনৈতিক দল এমন এমন কিছু মানুষের সমষ্টি, যার সদস্যরা অভিন্ন আদর্শ, নীতি বা কর্মসূচির ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ থাকে এবং সেসব নীতি ও কর্মসূচি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অংশীদার হওয়ার চেষ্টা করে (সারতোরি, ১৯৭৬; হেওউড, ২০১৯)। প্রতিনিধিত্বমূলক গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থাকে সুসংহত ও কার্যকর করতে এবং রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে গণতন্ত্রের কেন্দ্রীয় উপাদান হলো রাজনৈতিক দলসমূহ। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার কার্যকারিতা অনেকাংশে রাজনৈতিক দলসমূহের সাংগঠনিক সক্ষমতা, স্বচ্ছতা, জবাবদিহি এবং অভ্যন্তরীণ গণতান্ত্রিক চর্চার ওপর নির্ভরশীল (সারতোরি, ১৯৭৬; রাডল ও সাভাসান্দ, ২০০২; স্কারো, ২০০৫)। রাজনৈতিক দলগুলো কেবল নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী সংগঠন নয়, বরং নেতৃত্ব সৃষ্টি, জনমত গঠন করা, নীতিনির্ধারণ এবং রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে নাগরিকদের সম্পর্ক গঠনের ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ফলে রাজনৈতিক দলসমূহের অভ্যন্তরীণ শাসনব্যবস্থা, সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া, নেতৃত্ব নির্বাচন, আর্থিক ব্যবস্থাপনা এবং সদস্যদের অংশগ্রহণের ধরন বৃহত্তর গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার গুণগত মানকে প্রভাবিত করে (সারতোরি, ১৯৭৬; স্কারো, ২০০৫; আমুনসান, ২০১৬)।

বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে রাজনৈতিক দলসমূহ রাষ্ট্রগঠন, জাতীয়তাবাদী আন্দোলন এবং গণতান্ত্রিক রূপান্তরের গুরুত্বপূর্ণ চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করেছে। স্বাধীনতার পূর্বে পাকিস্তান আমলে ভাষা আন্দোলন, স্বায়ত্তশাসন আন্দোলন এবং মুক্তিযুদ্ধে রাজনৈতিক দলগুলো জনমত সংগঠিত ও রাজনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে (মনিরুজ্জামান, ২০২১)। বাংলাদেশের স্বাধীনতার পরে বিভিন্ন সামরিক ও কর্তৃত্ববাদী সরকার কর্তৃক সংবিধানসহ বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় বিধিবিধান পরিবর্তন, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের কার্যক্রম নিষিদ্ধকরণ, সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় রাজনৈতিক দল গঠন এবং রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান ও নির্বাচন ব্যবস্থার মাধ্যমে নিজেদের পক্ষে পরিচালিত করার দৃষ্টান্ত লক্ষ করা যায়। ১৯৭৫ সালে সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনীর মাধ্যমে বাকশাল প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বহুদলীয় রাজনৈতিক ব্যবস্থার পরিবর্তে একদলীয় রাজনৈতিক ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়। একই বছরের ১৫ আগস্টের রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর সামরিক শাসনের প্রেক্ষাপটে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের ওপর বিধিনিষেধ আরোপিত হয়। পরবর্তীতে ১৯৭৮ সালের রাজনৈতিক দল অধ্যাদেশ জারির মাধ্যমে বহুদলীয় রাজনীতির পুনঃপ্রবর্তনের পথ উন্মুক্ত হয়। তবে, ১৯৮২ সালের সামরিক আইন জারির মাধ্যমে সকল রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডকে পুনরায় স্থগিত করা হয়, তবে এই সময়ে সামরিক আইন জারি থাকলেও বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সরকার বিরোধী রাজনৈতিক আন্দোলন সক্রিয় ছিল। পরবর্তীতে ১৯৯০ সালের গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার পুনঃপ্রতিষ্ঠা রাজনৈতিক দলসমূহের জন্য নতুন সম্ভাবনা তৈরি করলেও রাজনৈতিক প্রতিযোগিতা মূলত দুই প্রধান দল ও তাদের নেতৃত্বাধীন জোটকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হতে শুরু করে (কামরুন নাহার, ২০২১)।

রাজনৈতিক দলসমূহের প্রাতিষ্ঠানিক বিকাশের ক্ষেত্রে বিভিন্ন সময়ে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের ওপর নিয়ন্ত্রণ, রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান ও নির্বাচনী প্রক্রিয়ার রাজনৈতিক ব্যবহার, ক্ষমতা কুক্ষিগত করার প্রবণতা, সীমিত অভ্যন্তরীণ গণতন্ত্র চর্চা এবং জবাবদিহিতার ঘাটতি দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে এবং একইসাথে দেশের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সংকট সৃষ্টি করেছে। বাংলাদেশে জাতীয় নির্বাচনকে কেন্দ্র করে প্রধান দুইটি রাজনৈতিক দল ও জোটের মধ্যকার রাজনৈতিক বিরোধ, আন্দোলন ও সহিংসতার ফলে ২০০৭ সালে সেনাসমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন করা হয় এবং দেশে জরুরি অবস্থা জারির মাধ্যমে পুনরায় সকল রাজনৈতিক কার্যক্রম স্থগিত করা হয়। পরবর্তীতে ২০০৮ সালে গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ (RPO, 1972) সংশোধনের মাধ্যমে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার ক্ষেত্রে রাজনৈতিক দলের নিবন্ধন বাধ্যতামূলক করা হয়। ২০০৯ সালে জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক দলসমূহের নিবন্ধন ও রাজনৈতিক কার্যক্রম শুরু হয় এবং জাতীয় সংসদ নির্বাচনের মাধ্যমে দেশে পুনরায় গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন হয়। তবে পরবর্তীকালে ২০১৪, ২০১৮ এবং ২০২৪ সালের প্রশ্নবিদ্ধ জাতীয় নির্বাচন রাজনৈতিক প্রতিযোগিতা, প্রতিনিধিত্ব এবং রাজনৈতিক অংশগ্রহণ একটি দল ও তার সহযোগী জোটের মধ্যে সীমিত হয়ে পড়ে।

২০২৪ সালের বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে ছাত্র-জনতার মূল প্রত্যাশা ছিল জবাবদিহিমূলক, গণতান্ত্রিক, স্বচ্ছ ও অংশগ্রহণমূলক শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে একটি বৈষম্যহীন, সম-অধিকারভিত্তিক ও অন্তর্ভুক্তিমূলক ‘নতুন বাংলাদেশ’ গড়া। এ লক্ষ্যে কর্তৃত্ববাদী সরকার পতন-পরবর্তী সময়ে গঠিত বিষয় ও খাতভিত্তিক সংস্কার কমিশনসমূহ বিদ্যমান রাষ্ট্র কাঠামো, আইন ও প্রতিষ্ঠানের দুর্বলতা চিহ্নিত করে সংস্কারের সুপারিশ প্রস্তাব করে। যার অংশ হিসেবে কয়েকটি সংস্কার কমিশন রাজনৈতিক দলগুলোর অভ্যন্তরীণ গণতন্ত্র চর্চা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি বিষয়ক আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারের বিষয়ে গুরুত্বারোপ করে এবং সুপারিশ প্রস্তাব করে। যা বাস্তবায়নের উদ্যোগ পরিলক্ষিত হয়নি। জুলাই গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে কর্তৃত্ববাদী সরকার পতনের পর রাষ্ট্র সংস্কারের অংশ হিসেবে রাজনৈতিক দলগুলোর কার্যক্রমে গণতন্ত্র চর্চা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি বিষয়ক সংস্কারের আলোচনা নতুন মাত্রা লাভ করে। রাজনৈতিক দলের সুশাসন কেবল দলের অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাপনার বিষয় হিসেবে নয়, বরং গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ, কার্যকর রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিতকরণ এবং জনগণের আস্থা বৃদ্ধির একটি গুরুত্বপূর্ণ পূর্বশর্ত হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। এই প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলসমূহের প্রাতিষ্ঠানিক সুশাসন বিশেষ করে দলগুলোর অভ্যন্তরীণ গণতন্ত্র চর্চা, নেতৃত্ব নির্বাচন, সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া,

প্রার্থী মনোনয়ন, আর্থিক ব্যবস্থাপনা, স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহির চর্চা মূল্যায়নের মাধ্যমে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও তা উত্তরণের পথ চিহ্নিত করা বাংলাদেশের সুশাসন ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ।

গবেষণার যৌক্তিকতা

বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামসহ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ও পুনঃপ্রতিষ্ঠার বিভিন্ন আন্দোলন-সংগ্রামে রাজনৈতিক দলসমূহ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে এবং দেশের সাধারণ মানুষের মধ্যে রাজনৈতিক সচেতনতা সৃষ্টিতে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছে। স্বাধীনতাপরবর্তী সময়ে বহুদলীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিকাশে রাজনৈতিক দলসমূহকে কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিবেচনা করা হলেও সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তাদের সাংগঠনিক চরিত্র ও শাসনপ্রক্রিয়া নিয়ে নানা প্রশ্ন ও উদ্বেগ উত্থাপিত হয়েছে।

বাংলাদেশের সংঘাতমূলক রাজনৈতিক সংস্কৃতি, নির্বাচনকেন্দ্রিক বিরোধ এবং সুশাসন সংকটের ধারাবাহিকতা অনুধাবন করতে রাজনৈতিক দলগুলোর নিজস্ব শাসনব্যবস্থা বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। পূর্ববর্তী গবেষণা ও বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, বাংলাদেশের অধিকাংশ রাজনৈতিক দল মূলত প্রধান সংগঠন হিসেবে পরিচালিত হয়, যেখানে সীমিত সংখ্যক নেতৃত্বস্থানীয় ব্যক্তির মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রবণতা বিদ্যমান এবং তৃণমূল পর্যায়ের নেতাকর্মী ও সাধারণ সদস্যদের কার্যকর অংশগ্রহণ অত্যন্ত সীমিত। এর ফলে দলগুলোর ভেতরে প্রাতিষ্ঠানিক জবাবদিহি দুর্বল হয়ে পড়ে, ভিন্নমতের পরিসর সংকুচিত হয় এবং যোগ্যতা ও দক্ষতার পরিবর্তে আনুগত্য ও ব্যক্তিগত সম্পর্ক অধিকার পায়।

এই কাঠামোগত দুর্বলতার সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলসমূহের অভ্যন্তরীণ সুশাসনে আরও কিছু গুরুতর ঘাটতির বিষয় গণমাধ্যম ও বিভিন্ন গবেষণায় ধারাবাহিকভাবে উঠে এসেছে। বিশেষত অভ্যন্তরীণ গণতন্ত্র চর্চার অভাব, নিয়মিত সম্মেলন ও নেতৃত্ব নির্বাচন না করা, আয়-ব্যয়ের স্বচ্ছতার ঘাটতি এবং প্রার্থী মনোনয়নে আর্থিক লেনদেন বা তথাকথিত “মনোনয়ন বাণিজ্য” সম্পর্কিত অভিযোগ রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতি জনআহ্বাকে ক্ষুণ্ণ করেছে। রাজনৈতিক দলগুলো দেশে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার পক্ষে অবস্থান গ্রহণ করলেও দলগুলোর প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে গণতন্ত্র চর্চার ব্যাপক ঘাটতি পরিলক্ষিত যা রাজনৈতিক ব্যবস্থার ভেতরে একটি সুস্পষ্ট কাঠামোগত দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করেছে। এই দ্বন্দ্ব শুধু দলীয় শাসনব্যবস্থার বিশ্বাসযোগ্যতাকেই প্রশ্নবিদ্ধ করেছে না; বরং সামগ্রিক গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার নৈতিক ভিত্তি ও কার্যকারিতার ওপরও নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে।

পূর্ববর্তী বিভিন্ন গবেষণায় লক্ষ করা যায় যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে রাজনৈতিক দলগুলোর ভূমিকা নির্বাচন ব্যবস্থায় অংশগ্রহণ, ক্ষমতার পালাবদল কিংবা বৃহত্তর গণতান্ত্রিক চর্চার প্রেক্ষাপটে বিশ্লেষিত হয়েছে। তবে গবেষণাসমূহে রাজনৈতিক দলসমূহকে একটি সংগঠিত ও প্রাতিষ্ঠানিক সত্তা হিসেবে বিবেচনা করে তাদের অভ্যন্তরীণ কার্যক্রম, সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া, নেতৃত্ব কাঠামো, আর্থিক ব্যবস্থাপনা এবং জবাবদিহি চর্চাকে সুশাসনের আলোকে নিবিড়ভাবে বিশ্লেষণের ঘাটতি রয়ে গেছে। ফলে রাজনৈতিক দলগুলোর প্রাতিষ্ঠানিক সুশাসন এবং এর সামগ্রিক গণতন্ত্র ও রাষ্ট্রীয় শাসনের ওপর প্রভাব সম্পর্কে একটি সমন্বিত ও প্রমাণভিত্তিক চিত্র পাওয়া কঠিন হয়ে পড়েছে।

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় রাজনৈতিক দলসমূহ যেহেতু একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান এবং গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ও শক্তিশালীকরণের প্রক্রিয়ায় তাদের ভূমিকা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ, সেহেতু দলসমূহের প্রাতিষ্ঠানিক শাসন (institutional governance) পর্যালোচনা অপরিহার্য। রাজনৈতিক দলগুলোর অভ্যন্তরীণ গণতান্ত্রিক চর্চা, সাংগঠনিক স্বচ্ছতা ও জবাবদিহির অভাব শুধুমাত্র দলীয় কাঠামোকেই দুর্বল করে না; বরং রাষ্ট্রক্ষমতায় গেলে কার্যকর, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও জবাবদিহিমূলক শাসন প্রতিষ্ঠার সক্ষমতাকেও ক্ষতিগ্রস্ত করে।

সুশাসন, গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া, কার্যকরী সংসদ প্রতিষ্ঠা, অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন, রাজনৈতিক অর্থায়নে স্বচ্ছতা, নির্বাচনী ইশতেহারে সুশাসন ও শুদ্ধাচার ইত্যাদি বিষয়ে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) নিয়মিতভাবে গবেষণা ও অধিপরামর্শ কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। যার ধারাবাহিকতায় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে এবং জবাবদিহিমূলক রাষ্ট্র ব্যবস্থা নির্মাণে, গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ও শক্তিশালীকরণ প্রক্রিয়ায় রাজনৈতিক দলসমূহের গুরুত্ব বিবেচনায় বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলসমূহের প্রাতিষ্ঠানিক সুশাসনের চ্যালেঞ্জ পর্যালোচনা করার উদ্দেশ্যে এই গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়।

গবেষণার উদ্দেশ্য

এই গবেষণার মূল উদ্দেশ্য হলো বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলসমূহের প্রাতিষ্ঠানিক সুশাসনের চ্যালেঞ্জ পর্যালোচনা করা। এবং সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য হলো-

১. রাজনৈতিক দল পরিচালনা সম্পর্কিত আইনি কাঠামো ও এর পরিপালন পর্যালোচনা করা
২. রাজনৈতিক দলের অভ্যন্তরীণ গণতান্ত্রিক চর্চা পর্যালোচনা করা
৩. রাজনৈতিক দলের আর্থিক ব্যবস্থাপনাসহ বিভিন্ন কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি পর্যালোচনা করা
৪. দলীয় কার্যক্রমে অনিয়ম-দুর্নীতির ধরন ও কারণ পর্যালোচনা করা
৫. গবেষণার ফলাফলের ভিত্তিতে সুপারিশমালা প্রণয়ন করা

গবেষণার পরিধি

এই গবেষণায় ২০০৮ সাল থেকে রাজনৈতিক দলের নিবন্ধন বাধ্যতামূলক হওয়ার পর থেকে বাংলাদেশের রাজনীতিতে সক্রিয় রাজনৈতিক দলসমূহের প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রম পর্যালোচনা করা হয়েছে। ২০০৮ সালের পর থেকে জাতীয় সংসদে প্রতিনিধিত্ব করা এবং জুলাই গণঅভ্যুত্থানসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক অন্দোলন-সংগ্রাম ও জুলাই গণঅভ্যুত্থান পরবর্তী সময়ে রাষ্ট্র সংস্কার কার্যক্রমে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করা নিবন্ধিত ও অনিবন্ধিত রাজনৈতিক দলগুলোকে এই গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

গবেষণার আওতাভুক্ত রাজনৈতিক দলসমূহের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ প্রাতিষ্ঠানিক ও সাংগঠনিক বিষয়সমূহ এই গবেষণায় পর্যালোচনা করা হয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো রাজনৈতিক দলের নিবন্ধন প্রক্রিয়া, দলের অভ্যন্তরীণ গণতান্ত্রিক চর্চা বিশেষত সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া, নেতৃত্ব নির্বাচন, বিভিন্ন স্তরে কমিটি গঠন, দলীয় মনোনয়ন প্রদান, নির্বাচনে অংশগ্রহণ, জবাবদিহি ব্যবস্থা, আর্থিক ব্যবস্থাপনা, শুদ্ধাচার চর্চা ইত্যাদি। ২০০৮ সাল থেকে ২০২৫ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত সময়কে গবেষণার বিবেচ্য কাল হিসেবে ধরা হয়েছে, তবে প্রাসঙ্গিকতা বিবেচনায় ক্ষেত্রবিশেষে ২০২৬ সালের আগস্ট পর্যন্ত সময়ের কিছু হালনাগাদ তথ্য-উপাত্ত ব্যবহার করা হয়েছে।

গবেষণার পদ্ধতি

গবেষণার বিষয়বস্তু, উদ্দেশ্য ও প্রকৃতি বিবেচনায় এ গবেষণায় গুণগত গবেষণা পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়েছে। তবে ক্ষেত্রবিশেষে পরিমাণগত তথ্য ব্যবহার ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

তথ্যের উৎস ও সংগ্রহ

এ গবেষণায় তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয় উৎস থেকে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রাথমিকভাবে তথ্য সংগ্রহ করার পর বিভিন্ন প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উৎস হতে সংগৃহীত তথ্যের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতা যাচাই করা হয়েছে।

- **প্রত্যক্ষ তথ্য:** প্রত্যক্ষ তথ্য সংগ্রহের জন্য মুখ্য তথ্যদাতাদের সরাসরি সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে। তথ্যদাতাদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিলেন- রাজনৈতিক নেতা-কর্মী, প্রতিটি দলের কেন্দ্রীয় পর্যায়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত/মনোনীত (দলকে প্রতিনিধিত্বকারী) কর্মী, নির্বাচন কমিশনের কর্মকর্তা, রাজনৈতিক বিশ্লেষক, শিক্ষক ও গবেষক।

গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত রাজনৈতিক দলসমূহের তথ্য সংগ্রহের জন্য চেকলিস্ট এবং মুখ্য তথ্যদাতাদের সাক্ষাৎকার গ্রহণের ক্ষেত্রে আধা-সংগঠিত প্রশ্নাবলি (Semi-structured Interview Schedule) ব্যবহার করা হয়েছে, যাতে গবেষণার নির্ধারিত প্রশ্নগুলোর পাশাপাশি তথ্যদাতাদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা, পর্যবেক্ষণ ও মতামত বিস্তারিতভাবে জানা যায়।

- **পরোক্ষ তথ্য:** পরোক্ষ তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে গবেষণার সাথে প্রাসঙ্গিক বিভিন্ন উৎস থেকে প্রামাণ্য তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে- সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক দলসমূহের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত বা দফতর থেকে সংগৃহীত দলের গঠনতন্ত্র ও নীতিমালা, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদন ও তথ্য, পূর্বে প্রকাশিত গবেষণা প্রতিবেদন ও একাডেমিক নথি, প্রাসঙ্গিক বই, জার্নাল প্রবন্ধ ও গবেষণামূলক নিবন্ধ, দেশীয় ও আন্তর্জাতিক সংবাদপত্রে প্রকাশিত প্রতিবেদন।

সারণি ১: তথ্যের ধরন, তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি ও তথ্যের উৎস

তথ্যের ধরন	তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি	তথ্যের উৎস
প্রত্যক্ষ তথ্য	মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার	রাজনৈতিক নেতা-কর্মী: প্রতিটি দলের কেন্দ্রীয় পর্যায়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত/মনোনীত (দলকে প্রতিনিধিত্বকারী) কর্মী, নির্বাচন কমিশনের কর্মকর্তা, রাজনৈতিক বিশ্লেষক, শিক্ষক ও গবেষক
পরোক্ষ তথ্য	পরোক্ষ তথ্য অনুসন্ধান ও সংগ্রহ	সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক দলসমূহের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত ও দফতর থেকে সংগৃহীত তথ্য এবং গণমাধ্যমে প্রকাশিত সংবাদ, গবেষণা প্রবন্ধ, পুস্তক

নমুনায়ন পদ্ধতি

এই গবেষণায় উদ্দেশ্যভিত্তিক নমুনা পদ্ধতি (পারপাসিভ স্যাম্পলিং) ব্যবহার করে ৪২টি রাজনৈতিক দল নির্বাচন করা হয়। নমুনার মধ্যে নিবন্ধিত ও অনিবন্ধিত, নতুন ও পুরাতন, জাতীয়তাবাদী বা মধ্যপন্থী, সমাজতান্ত্রিক বা ধর্মীয় মতাদর্শের রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিত্ব রয়েছে। গবেষণায় রাজনৈতিক দল নির্বাচনের ক্ষেত্রে প্রধান বিবেচ্য বিষয়ের মধ্যে রয়েছে ২০০৮ সালের পর থেকে জাতীয় সংসদে প্রতিনিধিত্ব করা নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল, জুলাই গণঅভ্যুত্থানসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক অন্দোলন-সংগ্রামে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করা এবং জুলাই গণঅভ্যুত্থান পরবর্তী সময়ে রাষ্ট্র সংস্কার কার্যক্রমে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করা নিবন্ধিত ও অনিবন্ধিত রাজনৈতিক দলসমূহ। গবেষণায় তথ্য সংগ্রহের জন্য ৪২টি রাজনৈতিক দলের সাথে একাধিকবার যোগাযোগ করা হলেও নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে গবেষণায় অংশগ্রহণের সম্মতি ও তথ্যদাতার প্রাপ্যতার ভিত্তিতে ৩২টি রাজনৈতিক দলের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে। এসব দলের কেন্দ্রীয় পর্যায়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতা ও কর্মীদের সাথে সরাসরি সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা

হয়। কিছু কিছু ক্ষেত্রে তৃণমূল পর্যায়ে নেতা-কর্মীদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ ও যাচাই করা হয়েছে। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, তথ্য সংগ্রহের প্রক্রিয়ায় বেশ কিছু প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে হয়েছে, বিশেষ করে অধিকাংশ রাজনৈতিক দল ও সংশ্লিষ্ট অংশীজন তথ্য প্রদানে সময়ক্ষেপণ, অসহযোগিতা এবং আংশিক তথ্য প্রদান করেছে।

সারণি ২ : গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত রাজনৈতিক দলের তালিকা

ক্রম	রাজনৈতিক দলের নাম	ক্রম	রাজনৈতিক দলের নাম
০১	বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিবি)	১৭	বাংলাদেশ লেবার পার্টি
০২	লিবারেল ডেমোক্রটিক পার্টি	১৮	জাতীয় গণতান্ত্রিক পার্টি
০৩	ন্যাশনাল পিপলস্ পার্টি (এনপিপি)	১৯	বাংলাদেশ মুসলিম লীগ
০৪	বাংলাদেশের বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টি	২০	বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী
০৫	বাংলাদেশ কল্যাণ পার্টি	২১	জাকের পার্টি
০৬	গণসংহতি আন্দোলন	২২	বিকল্পধারা বাংলাদেশ
০৭	রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন	২৩	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল
০৮	বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস	২৪	গণফোরাম
০৯	বাংলাদেশ মুসলিম লীগ-বিএমএল	২৫	জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশ
১০	ভাসানী জনশক্তি পার্টি (বর্তমান নাম)	২৬	বাংলাদেশ জাস্টিস পার্টি
১১	আমার বাংলাদেশ পার্টি (এবি পার্টি)	২৭	জাতীয় নাগরিক পার্টি
১২	জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক আন্দোলন-এনডিএম	২৮	খেলাফত মজলিস
১৩	বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (বাংলাদেশ ন্যাপ)	২৯	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ (বর্তমানে কার্যক্রম নিষিদ্ধ)
১৪	বাংলাদেশ মাইনরিটি জনতা পার্টি (বিএমজেপি)	৩০	বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টি
১৫	নাগরিক ঐক্য	৩১	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ)
১৬	ইসলামী ঐক্যজোট	৩২	জাতীয় পার্টি

তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে ১০টি রাজনৈতিক দলের সাথে একাধিকবার যোগাযোগ করা হলেও ইতিবাচক সাড়া প্রদান না করা বা সাক্ষাৎকার প্রদানে অপারগতা প্রকাশ করা হয়। তথাপি, ৩২টি রাজনৈতিক দল এবং সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞ ও গবেষকদের কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্য গবেষণার উদ্দেশ্য পূরণে প্রতিনিধিত্বমূলক বলে বিবেচিত হয়েছে। পাশাপাশি, পরোক্ষ তথ্যসূত্রের কার্যকর ব্যবহারের মাধ্যমে তথ্যের ঘাটতি পূরণ করা হয়েছে।

সারণি ৩: গবেষণায় তথ্য প্রদানে অপারগতা প্রকাশ ও সাড়া প্রদান না করা রাজনৈতিক দলের তালিকা

ক্রম	রাজনৈতিক দলের নাম
০১	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জেএসডি
০২	বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ
০৩	বাংলাদেশ জাতীয় পার্টি (বিজেপি)
০৪	বাংলাদেশ তরিকত ফেডারেশন
০৫	বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলন
০৬	গণ অধিকার পরিষদ (জিওপি)
০৭	গণফ্রন্ট
০৮	ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ
০৯	বাংলাদেশ এলডিপি (বর্তমানে বিলুপ্ত)
১০	জাতীয় গণফ্রন্ট

বিশ্লেষণ কাঠামো

এই গবেষণায় একটি বিশ্লেষণ কাঠামোর মাধ্যমে রাজনৈতিক দলসমূহে প্রাতিষ্ঠানিক সুশাসন বিশ্লেষণ করা হয়েছে। সুনির্দিষ্ট ছয়টি সুশাসনের নির্দেশকের আলোকে রাজনৈতিক দলের বিভিন্ন কার্যক্রম ও বিষয় পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। বিশ্লেষণ কাঠামোর বিষয়বস্তুর আলোকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। নিচের সারণিতে গবেষণায় ব্যবহৃত সুশাসনের নির্দেশক ও সংশ্লিষ্ট পর্যবেক্ষণের বিষয়বস্তু উপস্থাপন করা হলো।

সারণি ৪: সুশাসনের নির্দেশক ও পর্যবেক্ষণ বিষয়বস্তু

সুশাসনের নির্দেশক	পর্যবেক্ষণের বিষয়বস্তু
আইনের পরিপালন	রাষ্ট্রীয় আইন, প্রাসঙ্গিক বিধি-বিধান, দলীয় গঠনতন্ত্র পরিপালন
অভ্যন্তরীণ গণতন্ত্র চর্চা	বিভিন্ন পর্যায়ের কমিটি গঠন, নেতৃত্ব নির্বাচন, মনোনয়ন প্রক্রিয়া
অংশগ্রহণ ও অন্তর্ভুক্তি	কমিটিতে নারী কর্মীর অন্তর্ভুক্তি, নারী প্রার্থী মনোনয়ন, দলীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া ও তৃণমূলের অংশগ্রহণ
স্বচ্ছতা	আয় ও ব্যয়, আর্থিক প্রতিবেদন, নীতি, গঠনতন্ত্র, দলীয় কার্যক্রম, কমিটি বিষয়ক তথ্য প্রকাশ
অনিয়ম-দুর্নীতি	অনিয়ম-দুর্নীতি প্রতিরোধ ব্যবস্থা, কমিটি গঠন, মনোনয়ন প্রক্রিয়া, আর্থিক ব্যবস্থাপনা দলের নিবন্ধন কার্যক্রম ইত্যাদি
জবাবদিহি	কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় সম্মেলন (কাউন্সিল), দলীয় শৃঙ্খলা ব্যবস্থা, অভ্যন্তরীণ জবাবদিহি ব্যবস্থা, নিরীক্ষা, আর্থিক প্রতিবেদন জমাদান

অধ্যায় ২: রাজনৈতিক দলীয় ব্যবস্থা ও গণতন্ত্র

রাজনৈতিক দল, গণতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা

আধুনিক প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রে রাজনৈতিক দলকে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিবেচনা করা হয়। নাগরিকদের রাজনৈতিক চাহিদা ও স্বার্থকে রাষ্ট্রের নীতিনির্ধারণী প্রক্রিয়ার সঙ্গে সংযুক্ত করা, রাজনৈতিক অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করা এবং সরকার গঠনের জন্য নেতৃত্ব ও নীতিগত বিকল্প প্রদান করা রাজনৈতিক দলের মৌলিক ভূমিকার মধ্যে অন্যতম (স্যাটল্লাইডার, ১৯৪২; সারতোরি, ১৯৭৬)। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে রাজনৈতিক দলসমূহ কেবল নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী সংগঠন নয়; বরং রাষ্ট্র ও নাগরিক সমাজের মধ্যকার একটি গুরুত্বপূর্ণ মধ্যস্থতাকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করে। সময়ের পরিক্রমায় আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহে রাজনৈতিক দলের গুরুত্ব ও কার্যপরিধি বিবেচনায় সাংবিধানিক স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে, যা গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার কার্যকর পরিচালনার জন্য অপরিহার্য (ভান বিজেন, ২০০৩)।

গণতন্ত্রের কার্যকারিতা অনেকাংশে রাজনৈতিক দলসমূহের মধ্যকার অবাধ ও প্রতিযোগিতামূলক রাজনৈতিক পরিবেশের ওপর নির্ভরশীল। বহুত্ববাদী গণতন্ত্রের ধারণা অনুযায়ী, নাগরিকদের রাজনৈতিক পছন্দ ও মতামতের প্রতিফলন নিশ্চিত করতে হলে এমন একটি রাজনৈতিক ব্যবস্থা প্রয়োজন যেখানে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল স্বাধীনভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারে এবং জনগণ বিকল্প রাজনৈতিক শক্তির মধ্যে থেকে নিজেদের প্রতিনিধি নির্বাচন করার সুযোগ পায় (ডাল, ১৯৭১; লিডবার্গ, ২০০৬)। বিভিন্ন রাজনৈতিক আদর্শ ও দলসমূহের মধ্যে রাজনৈতিক প্রতিযোগিতাই নাগরিকদের রাজনৈতিক অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার অন্যতম কার্যকর উপায় হিসেবে বিবেচিত হয় এবং এর মাধ্যমে রাজনৈতিক বহুত্ববাদ (political pluralism) বিকশিত হয় এবং নাগরিক অংশগ্রহণের ক্ষেত্র সম্প্রসারিত হয় (সারতোরি, ১৯৭৬; স্কারো, ২০০৫)। ফলে রাজনৈতিক দল কেবল ক্ষমতা অর্জনের মাধ্যম নয়; বরং গণতান্ত্রিক প্রতিযোগিতা, রাজনৈতিক অন্তর্ভুক্তি এবং জবাবদিহিমূলক শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার একটি প্রধান ভিত্তি।

রাজনৈতিক দলসমূহ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে প্রতিনিধিত্ব ও অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার পাশাপাশি রাজনৈতিক নেতৃত্ব সৃষ্টি ও নীতিনির্ধারণ প্রক্রিয়াতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। দলগুলো নাগরিকদের দাবি, স্বার্থ এবং প্রত্যাশাকে সংগঠিত করে জননীতিতে রূপান্তরিত করে এবং নির্বাচনের মাধ্যমে রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য নেতৃত্ব নির্বাচন ও প্রস্তুত করে (ওএসসিই/ওডিআইএইচআর, ২০১১; ভেনিস কমিশন, ২০১৪)। একই সঙ্গে রাজনৈতিক দল সমাজের বিভিন্ন শ্রেণি, গোষ্ঠী ও অঞ্চলের মধ্যে রাজনৈতিক সংযোগ স্থাপন করে এবং জনগণকে রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় সম্পৃক্ত করার মাধ্যমে রাষ্ট্রের বৈধতা (legitimacy) শক্তিশালী করে। রাজনৈতিক দলসমূহের এই মৌলিক গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে রাষ্ট্রবিজ্ঞানী স্যাটল্লাইডার সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করেন যে, “রাজনৈতিক দলগুলিই গণতন্ত্র সৃষ্টি করেছে এবং (...) আধুনিক গণতন্ত্র রাজনৈতিক দল ছাড়া কল্পনা করা যায় না” কারণ গণতান্ত্রিক রাজনীতির অধিকাংশ কার্যক্রমই দলীয় প্রতিযোগিতা এবং সংগঠনের মধ্য দিয়ে পরিচালিত হয় (স্যাটল্লাইডার, ১৯৪২)।

গণতন্ত্রের স্থায়িত্ব ও কার্যকারিতার জন্য শুধু রাজনৈতিক দলের উপস্থিতিই যথেষ্ট নয়; বরং একটি কার্যকর দলীয় ব্যবস্থার (party system) উপস্থিতি থাকা অপরিহার্য। রাজনৈতিক দলসমূহের মধ্যকার সম্পর্ক, প্রতিযোগিতার ধরন এবং প্রাতিষ্ঠানিক স্থিতিশীলতা একটি রাজনৈতিক ব্যবস্থার গণতান্ত্রিক চরিত্র নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে (মেইনওয়ারিং ও স্কারি, ১৯৯৫)। শক্তিশালী ও প্রাতিষ্ঠানিকীকৃত দলীয় ব্যবস্থা রাষ্ট্রের রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা, নীতিনির্ধারণের ধারাবাহিকতা এবং গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যকারিতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করে (লেভিটসকি এবং জিরাট, ২০১৮)। অপরদিকে দুর্বল, ব্যক্তিকেন্দ্রিক বা অপ্রাতিষ্ঠানিক দলীয় ব্যবস্থা রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা, গণতান্ত্রিক দুর্বলতা এবং শাসনব্যবস্থার অস্থিতিশীলতা সৃষ্টি করতে পারে।

তবে রাজনৈতিক দল ও গণতন্ত্রের এই ইতিবাচক সম্পর্ক সর্বদা নিরবচ্ছিন্ন থাকে না। রাজনৈতিক বিজ্ঞান সাহিত্যে দীর্ঘদিন ধরেই রাজনৈতিক দলবিরোধী (anti-party) দৃষ্টিভঙ্গির উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। সমালোচকদের মতে রাজনৈতিক দল অনেক সময় সংকীর্ণ গোষ্ঠীগত স্বার্থের বাহক, রাজনৈতিক মেরুকরণের উৎস কিংবা জনস্বার্থের পরিবর্তে দলীয় স্বার্থকে অগ্রাধিকার প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানে পরিণত হতে পারে (সুরি, ২০০৭)। বিংশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে বিভিন্ন দেশে রাজনৈতিক দলসমূহের প্রতি জনআস্থা হ্রাস, দলীয় সদস্যপদ কমে যাওয়া এবং রাজনৈতিক অংশগ্রহণের নতুন রূপের বিস্তারের ফলে রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্বের ক্ষেত্রে দলগুলোর একচেটিয়া অবস্থানও চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছে। সামাজিক আন্দোলন, নাগরিক উদ্যোগ এবং ডিজিটাল রাজনৈতিক অংশগ্রহণের বিকাশ রাজনৈতিক সংগঠনের নতুন বিকল্প ক্ষেত্র উন্মোচন করেছে, যা প্রচলিত দলীয় রাজনীতির সীমাবদ্ধতাগুলোকে আরও দৃশ্যমান করেছে।

তবুও অধিকাংশ গবেষক একমত যে রাজনৈতিক দল এখনও গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার অপরিহার্য উপাদান। কারণ নাগরিকদের রাজনৈতিক অংশগ্রহণের ধারাবাহিক ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো, নেতৃত্ব নির্বাচন, জনস্বার্থের প্রতিনিধিত্ব এবং রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য বিকল্প রাজনৈতিক কর্মসূচি প্রদানের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক দলের কার্যকর বিকল্প এখনও প্রতিষ্ঠিত হয়নি (ভান বিজেন, ২০০৩; ওএসসিই/ওডিআইএইচআর, ২০১১)। ফলে রাজনৈতিক দলের প্রতি জনআস্থা হ্রাস কিংবা প্রতিনিধিত্ব সংকটের সমাধান রাজনৈতিক দলের বিকল্প তৈরি করার মধ্য দিয়ে নয়; বরং দলগুলোর গণতান্ত্রিক সক্ষমতা, জবাবদিহি এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক চরিত্রকে শক্তিশালী করার মধ্য দিয়েই অধিকতর সম্ভব।

এই প্রেক্ষাপটে রাজনৈতিক দলের কার্যকারিতা, প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা এবং অভ্যন্তরীণ গণতান্ত্রিক চর্চার প্রশ্নটি বিশেষ গুরুত্ব লাভ করে। কারণ রাজনৈতিক দলসমূহ যেভাবে সংগঠিত ও পরিচালিত হয়, তা কেবল তাদের নিজস্ব কার্যক্রমকেই প্রভাবিত করে না; বরং বৃহত্তর রাজনৈতিক ব্যবস্থা, গণতান্ত্রিক শাসন এবং রাজনৈতিক উন্নয়নের গতিপ্রকৃতিকেও গভীরভাবে প্রভাবিত করে। তাই রাজনৈতিক দল ও গণতন্ত্রের পারস্পরিক সম্পর্ক অনুধাবনের জন্য রাজনৈতিক উন্নয়ন ও সংস্কৃতি ধারণা বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন, যা রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান ও গণতান্ত্রিক চর্চার গুণগত বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করতে সহায়তা করে।

রাজনৈতিক উন্নয়ন ও রাজনৈতিক সংস্কৃতি

রাজনৈতিক দল গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার অন্যতম প্রধান প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি হলেও একটি রাষ্ট্রে গণতন্ত্রের কার্যকারিতা ও স্থায়িত্ব কেবল রাজনৈতিক দলের অস্তিত্বের ওপর নির্ভর করে না। বরং রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের সক্ষমতা, নাগরিক অংশগ্রহণের প্রকৃতি, রাষ্ট্রের জবাবদিহিমূলক কাঠামো এবং গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের বিকাশের সাথে রাজনৈতিক ব্যবস্থার সামগ্রিক উন্নয়ন নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত। এই বৃহত্তর প্রক্রিয়াকে ব্যাখ্যা করার জন্য রাজনৈতিক বিজ্ঞান সাহিত্যে ‘রাজনৈতিক উন্নয়ন’ (political development) এবং ‘রাজনৈতিক সংস্কৃতি’ (political culture) ধারণা দুটি বিশেষ গুরুত্ব লাভ করেছে। রাজনৈতিক উন্নয়ন একটি রাষ্ট্রের রাজনৈতিক ব্যবস্থা কতটা প্রাতিষ্ঠানিকভাবে সুসংগঠিত, কার্যকর এবং সামাজিক চাহিদা মোকাবিলায় সক্ষম, তা ব্যাখ্যা করে; অন্যদিকে রাজনৈতিক সংস্কৃতি নাগরিকদের রাজনৈতিক মূল্যবোধ, বিশ্বাস, আচরণ এবং রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের প্রতি মনোভাবকে নির্দেশ করে। ফলে রাজনৈতিক উন্নয়ন এবং রাজনৈতিক সংস্কৃতি পরস্পর সম্পর্কযুক্ত দুটি ধারণা, যা একটি দেশের গণতান্ত্রিক অগ্রগতি ও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা বোঝার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ বিশ্লেষণাত্মক কাঠামো প্রদান করে।

রাজনৈতিক উন্নয়ন ধারণাটি বিশেষভাবে গুরুত্ব লাভ করে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী সময়ে, যখন নব্যবাহীন রাষ্ট্রসমূহে রাষ্ট্রগঠন, রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা এবং আধুনিক শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার প্রশ্নটি আন্তর্জাতিক গবেষণার কেন্দ্রে আসে। প্রাথমিকভাবে রাজনৈতিক উন্নয়নকে আধুনিকায়ন (modernization) প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে ব্যাখ্যা করা হয়। তবে আধুনিকায়ন তাত্ত্বিকদের মতে, রাজনৈতিক উন্নয়ন এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে ঐতিহ্যনির্ভর ও সীমিত অংশগ্রহণমূলক রাজনৈতিক ব্যবস্থা ধীরে ধীরে অধিকতর আধুনিক, জটিল এবং অংশগ্রহণভিত্তিক রাজনৈতিক ব্যবস্থায় রূপান্তরিত হয়। এই দৃষ্টিভঙ্গিতে রাজনৈতিক উন্নয়নের সাথে রাজনৈতিক অংশগ্রহণের সম্প্রসারণ, প্রশাসনিক দক্ষতা, প্রাতিষ্ঠানিক বিভাজন এবং নাগরিকত্বের বিস্তারকে সম্পৃক্ত করা হয় (আলমন্ড ও কোলম্যান, ১৯৬০; পাই, ১৯৬৫)। রাজনৈতিক উন্নয়ন সাধারণত আর্থ-সামাজিকসহ অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পরিবর্তনের প্রক্রিয়া হিসেবে দেখা হয়, যার মাধ্যমে রাজনৈতিক ব্যবস্থা ক্রমাগত অধিক প্রাতিষ্ঠানিক, অংশগ্রহণমূলক এবং জবাবদিহিমূলক চরিত্র অর্জন করে। এই প্রক্রিয়ার অন্যতম লক্ষ্য হলো সমাজের সকল স্তরের নাগরিকের রাজনৈতিক অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা এবং রাষ্ট্রের সঙ্গে তাদের সম্পর্কে কার্যকর ও অন্তর্ভুক্তিমূলক করে তোলা। তবে বাস্তবে রাজনৈতিক উন্নয়ন কোনো সরলরেখিক বা সর্বজনীন পথ অনুসরণ করে না; বরং রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক কাঠামোর পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়া, ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট এবং বিভিন্ন অপ্রত্যাশিত পরিবর্তনের ফলে এর গতিপথ ও ফলাফল দেশভেদে ভিন্ন হয়ে থাকে (রহমান, ২০১৭)।

তবে রাজনৈতিক উন্নয়নকে কেবল আধুনিকায়ন বা গণতান্ত্রিক সম্প্রসারণের সমার্থক হিসেবে দেখার প্রবণতা পরবর্তীকালে সমালোচনার মুখে পড়ে। রাজনৈতিক উন্নয়নের মূল উপাদান হলো রাজনৈতিক প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ (political institutionalization), অর্থাৎ রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনসমূহের স্থায়িত্ব, অভিযোজনক্ষমতা, জটিলতা এবং স্বায়ত্তশাসন অর্জনের প্রক্রিয়া। উন্নয়নশীল রাষ্ট্রসমূহে রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার উৎস সাধারণত রাজনৈতিক অংশগ্রহণের বিস্তার নয়; বরং সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট নতুন রাজনৈতিক দাবির সঙ্গে তাল মিলিয়ে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের বিকাশ না ঘটায় মধ্যে নিহিত। যখন রাজনৈতিক সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানসমূহ নাগরিকদের ক্রমবর্ধমান অংশগ্রহণকে কার্যকরভাবে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে ব্যর্থ হয়, তখন রাজনৈতিক ব্যবস্থায় অস্থিরতা, সংঘাত এবং বৈধতার সংকট তৈরি হতে পারে। ফলে টেকসই গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য রাজনৈতিক অংশগ্রহণের সম্প্রসারণের পাশাপাশি শক্তিশালী ও কার্যকর রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা অপরিহার্য (হান্টিংটন, ১৯৬৮)।

এই প্রেক্ষাপটে রাজনৈতিক উন্নয়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাত্রা হলো রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের কার্যকারিতা ও বৈধতা। একটি উন্নয়নমুখী রাজনৈতিক ব্যবস্থায় রাষ্ট্রের আইনসভা, বিচারব্যবস্থা, নির্বাহী বিভাগ, নির্বাচন কমিশন, রাজনৈতিক দল এবং অন্যান্য প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো স্বতন্ত্র ও কার্যকরভাবে পরিচালিত হয়। এসব প্রতিষ্ঠান কেবল রাষ্ট্র পরিচালনার আনুষ্ঠানিক দায়িত্ব পালন করে না; বরং সামাজিক দ্বন্দ্ব ব্যবস্থাপনা, রাজনৈতিক প্রতিযোগিতা নিয়ন্ত্রণ এবং ক্ষমতার শান্তিপূর্ণ হস্তান্তরের সুযোগ সৃষ্টি করে। নাগরিকরা যখন এসব প্রতিষ্ঠানকে কার্যকর, নিরপেক্ষ এবং বিশ্বাসযোগ্য হিসেবে উপলব্ধি করে, তখন রাজনৈতিক ব্যবস্থার বৈধতা বৃদ্ধি পায় এবং দীর্ঘমেয়াদে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠিত হয় (হান্টিংটন, ১৯৬৮; ডায়মন্ড, ১৯৯৯)।

রাজনৈতিক উন্নয়নের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা ও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার পাশাপাশি রাজনৈতিক অংশগ্রহণের প্রসার সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ। রাজনৈতিকভাবে উন্নত সমাজে নাগরিকরা কেবল রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে গণ্য হয় না, বরং সক্রিয় রাজনৈতিক অংশীজন হিসেবে বিবেচিত হয়। তারা ভোটদান, রাজনৈতিক সংগঠনে সম্পৃক্ততা, জনমত গঠন এবং বিভিন্ন সমষ্টিগত রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে শাসন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে। তবে রাজনৈতিক অংশগ্রহণ তখনই গণতান্ত্রিক উন্নয়নের সহায়ক শক্তিতে পরিণত হয়, যখন তা অন্তর্ভুক্তিমূলক, অর্থবহ এবং সমাজের সকল শ্রেণি, লিঙ্গ, জাতিগত ও সামাজিক গোষ্ঠীর জন্য সমভাবে উন্মুক্ত থাকে। অর্থাৎ

নাগরিকদের নিজস্ব মতামত প্রকাশ, স্বার্থ উপস্থাপন এবং নীতিনির্ধারণী প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করার কার্যকর সুযোগ নিশ্চিত করা রাজনৈতিক উন্নয়নের একটি মৌলিক পূর্বশর্ত (লেফটউইচ, ১৯৯৬)।

রাজনৈতিক উন্নয়নকে শুধুমাত্র প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বা রাজনৈতিক অংশগ্রহণের পরিমাপের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা যথেষ্ট নয়, কারণ এর সঙ্গে রাজনৈতিক সংস্কৃতির একটি ঘনিষ্ঠ ও পারস্পরিক সম্পর্ক বিদ্যমান। রাজনৈতিক সংস্কৃতি বলতে নাগরিকদের রাজনৈতিক বিশ্বাস, মূল্যবোধ, মনোভাব এবং রাজনৈতিক আচরণের সেই সমষ্টিগত কাঠামোকে বোঝায়, যা রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান ও প্রক্রিয়ার প্রতি তাদের দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রভাবিত করে। নাগরিকরা গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান, নির্বাচন, আইনের শাসন, রাজনৈতিক প্রতিযোগিতা এবং বিরোধী মতামতের প্রতি কতটা আস্থা ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে, তার ওপর রাজনৈতিক ব্যবস্থার কার্যকারিতা অনেকাংশে নির্ভরশীল। তাই রাজনৈতিক উন্নয়নকে টেকসই ও অর্থবহ করতে হলে প্রাতিষ্ঠানিক বিকাশের পাশাপাশি গণতান্ত্রিক মূল্যবোধভিত্তিক রাজনৈতিক সংস্কৃতির বিকাশও সমানভাবে প্রয়োজনীয়।

গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক সংস্কৃতির মূল উপাদানগুলোর মধ্যে রয়েছে সহনশীলতা, সমঝোতার মানসিকতা, রাজনৈতিক বহুত্ববাদের প্রতি শ্রদ্ধা, আইনের শাসনের প্রতি আস্থা এবং বিরোধী মতের বৈধতা স্বীকার করার প্রবণতা। গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান টেকসই করতে হলে নাগরিক সমাজে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের বিকাশ অপরিহার্য। অন্যদিকে রাজনৈতিক অসহিষ্ণুতা, ব্যক্তিপূজা, সহিংস রাজনৈতিক আচরণ বা কর্তৃত্ববাদী প্রবণতা রাজনৈতিক সংস্কৃতির অংশ হয়ে উঠলে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যকারিতা দুর্বল হয়ে পড়ে (ডায়মন্ড, ১৯৯৯)। ফলে রাজনৈতিক উন্নয়নের গতি ও দিক নির্ধারণে রাজনৈতিক সংস্কৃতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। একদিকে শক্তিশালী ও জবাবদিহিমূলক প্রতিষ্ঠান নাগরিকদের মধ্যে গণতান্ত্রিক আচরণ ও রাজনৈতিক আস্থা গড়ে তুলতে সহায়তা করে; অন্যদিকে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধসম্পন্ন নাগরিকসমাজ রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে অধিকতর জবাবদিহিমূলক ও অংশগ্রহণমূলক হতে উৎসাহিত করে। ফলে রাজনৈতিক উন্নয়নকে কেবল রাষ্ট্রকেন্দ্রিক বা প্রতিষ্ঠানকেন্দ্রিক প্রক্রিয়া হিসেবে ব্যাখ্যা করা যথেষ্ট নয়; বরং এটি রাষ্ট্র, রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান এবং নাগরিক সমাজের মধ্যকার আন্তঃসম্পর্কের ফলাফল।

তবে রাজনৈতিক উন্নয়ন কোনো সরলরৈখিক, একমুখী বা অপরিবর্তনীয় প্রক্রিয়া নয়। রাজনৈতিক ব্যবস্থার অগ্রগতি সবসময় ধারাবাহিকভাবে সংঘটিত হয় না; বরং বিভিন্ন রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণে তা বাধাগ্রস্ত বা পশ্চাৎমুখীও হতে পারে। রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের দুর্বলতা, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের অবক্ষয়, রাজনৈতিক মেরুকরণের বৃদ্ধি, কর্তৃত্ববাদী প্রবণতার বিকাশ কিংবা অর্থনৈতিক ও সামাজিক সংকটের ফলে রাজনৈতিক উন্নয়নের পূর্ববর্তী অর্জনসমূহও ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে (হান্টিংটন, ১৯৬৮; ডায়মন্ড, ১৯৯৯)। ফলে রাজনৈতিক উন্নয়নকে একটি চলমান ও গতিশীল প্রক্রিয়া হিসেবে বিবেচনা করা অধিকতর যৌক্তিক, যেখানে শক্তিশালী রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান, অর্থবহ নাগরিক অংশগ্রহণ এবং গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক সংস্কৃতির ধারাবাহিক বিকাশ পরস্পর সম্পূরক উপাদান হিসেবে কাজ করে।

সুতরাং রাজনৈতিক উন্নয়ন এবং রাজনৈতিক সংস্কৃতি পরস্পরনির্ভরশীল ধারণা, যা একটি রাষ্ট্রে গণতন্ত্রের গুণগত মান, প্রাতিষ্ঠানিক স্থিতিশীলতা এবং নাগরিক অংশগ্রহণের প্রকৃতি ব্যাখ্যা করতে সাহায্য করে। রাজনৈতিক দল, রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান এবং নাগরিক সমাজের কার্যকারিতা এই বৃহত্তর রাজনৈতিক উন্নয়ন ও সংস্কৃতির কাঠামোর মধ্যেই গঠিত ও পরিচালিত হয়।

বাংলাদেশের রাজনৈতিক উন্নয়ন, রাজনৈতিক সংস্কৃতি ও দলীয় রাজনীতি

বাংলাদেশের রাজনৈতিক উন্নয়ন এবং সংস্কৃতির বিবর্তন রাজনৈতিক দলসমূহের বিকাশ, রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান নির্মাণ এবং গণতান্ত্রিক চর্চার ইতিহাসের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যকারিতা, জবাবদিহি এবং স্থিতিশীলতাকে প্রভাবিত করে রাজনৈতিক উন্নয়ন ও সংস্কৃতি। অন্যদিকে রাজনৈতিক দলসমূহও রাজনৈতিক সমাজিকীকরণ, নাগরিক অংশগ্রহণ এবং গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ফলে রাজনৈতিক দল, রাজনৈতিক উন্নয়ন এবং রাজনৈতিক সংস্কৃতি পরস্পর নির্ভরশীল ও আন্তঃসম্পর্কযুক্ত প্রক্রিয়া হিসেবে কাজ করে। রাজনৈতিক উন্নয়ন বলতে বোঝায় রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ, শাসনকার্য পরিচালনায় রাষ্ট্রের সক্ষমতা এবং জনগণের চাহিদার প্রতি রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের জবাবদিহি।

বাংলাদেশে রাজনৈতিক উন্নয়ন একটি উপনিবেশিক অতীতের ধারাবাহিকতায় গড়ে উঠেছে এবং স্বাধীনতা পরবর্তী শাসনব্যবস্থা, প্রাতিষ্ঠানিক স্থিতিশীলতা ও অন্তর্ভুক্তিমূলক অংশগ্রহণ নানাবিধ ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে গঠিত হয়েছে। উপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ আন্দোলন, পাকিস্তান আমলে ভাষা আন্দোলন, স্বায়ত্তশাসনের দাবি এবং মুক্তিযুদ্ধ জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক চেতনার বিকাশ ঘটিয়েছে (জাহান, ২০০৫; রিয়াজ, ২০১৬)। স্বাধীন বাংলাদেশে ঐতিহাসিক ঘটনা প্রবাহ রাজনৈতিক বৈধতা, নাগরিক অংশগ্রহণ এবং গণতান্ত্রিক আকাঙ্ক্ষার ভিত্তি নির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। স্বাধীনতা অর্জনের পর গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা, অর্থনৈতিক সংকট, শাসনগত দুর্বলতা এবং সীমিত প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতার কারণে বারবার চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়েছে। ফলে নির্বাচন কমিশন, আইনসভা, বিচার বিভাগ, জনপ্রশাসন এবং রাজনৈতিক দলসমূহের মতো গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানগুলো প্রত্যাশিত মাত্রায় প্রাতিষ্ঠানিক স্বায়ত্তশাসন, নিরপেক্ষতা এবং কার্যকারিতা অর্জনে ব্যর্থ হয়েছে। একই সঙ্গে আনুষ্ঠানিক নিয়মতান্ত্রিক কাঠামোর তুলনায় ব্যক্তিকেন্দ্রিক নেতৃত্ব, পৃষ্ঠপোষকতাভিত্তিক রাজনৈতিক সম্পর্ক এবং অনানুষ্ঠানিক ক্ষমতা কাঠামোর প্রভাব শক্তিশালী হয়ে ওঠে (জাহান, ২০০৫; রিয়াজ, ২০১৫)।

ফলস্বরূপ, বাংলাদেশের রাজনৈতিক উন্নয়নকে রাজনৈতিক অংশগ্রহণের সম্প্রসারণ এবং প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের মধ্যকার একটি চলমান, গতিশীল ও জটিল আন্তঃসম্পর্ক বিরাজমান। গণতান্ত্রিক অংশগ্রহণ, প্রতিনিধিত্ব এবং রাজনৈতিক অন্তর্ভুক্তির দাবি ক্রমাগত বিস্তৃত হলেও দাবিগুলোকে ধারণ ও পরিচালনা করার জন্য প্রয়োজনীয় রাজনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান নির্মাণ এবং প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধির প্রচেষ্টাও সমান্তরালভাবে অগ্রসর হয়েছে। তবে এই দুই প্রক্রিয়ার মধ্যে বিদ্যমান ভারসাম্যহীনতা, প্রাতিষ্ঠানিক দুর্বলতা এবং রাজনৈতিক প্রতিযোগিতার প্রকৃতি বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক বিকাশের গতিপথকে উল্লেখযোগ্যভাবে প্রভাবিত করেছে।

১৯৯১ সালে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠার পর নিয়মিত নির্বাচন, ক্ষমতার পরিবর্তন এবং রাজনৈতিক অংশগ্রহণের সুযোগ বৃদ্ধি পেলেও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যকর স্বায়ত্তশাসন এবং গণতান্ত্রিক জবাবদিহি কাজিফত মাত্রায় প্রতিষ্ঠিত হয়নি (জাহান, ২০১৫; হাসান, ২০১৯)। রাজনৈতিক প্রতিযোগিতা ক্রমেই দুটি প্রধান রাজনৈতিক শক্তিকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হতে থাকে, যার ফলে রাজনৈতিক ব্যবস্থায় উচ্চমাত্রার মেরুকরণ, পারস্পরিক অবিশ্বাস এবং সংঘাতমুখী রাজনৈতিক সংস্কৃতির বিকাশ ঘটে। অনেক ক্ষেত্রে রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা নীতিগত বিতর্ক বা কর্মসূচিভিত্তিক প্রতিযোগিতার পরিবর্তে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণের প্রতিযোগিতায় পরিণত হয়েছে।

বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতির আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো পৃষ্ঠপোষকতাভিত্তিক বা patron-client সম্পর্কের বিস্তার। দলীয় কাঠামোতে ক্ষমতা প্রধান নেতৃত্বের হাতে সীমাবদ্ধ থাকা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় তৃণমূলের সীমিত অংশগ্রহণসহ, রাজনৈতিক আনুগত্য এবং পৃষ্ঠপোষকতামূলক সম্পর্কের ভিত্তিতে সম্পদ ও রাজনৈতিক সুযোগ-সুবিধা বন্টনের প্রবণতাও বিদ্যমান। এর ফলে রাজনৈতিক দলগুলোতে আনুষ্ঠানিক সাংগঠনিক প্রক্রিয়া, নীতিগত অবস্থান এবং সদস্যভিত্তিক অংশগ্রহণের পরিবর্তে ব্যক্তি, গোষ্ঠী এবং ক্ষমতাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছে (খান, ২০০৫; খান, ২০২৩)। পৃষ্ঠপোষকতার ভিত্তিতে গড়ে ওঠা সম্পর্কের মাধ্যমে রাজনৈতিক সমর্থন ও আনুগত্যের বিনিময়ে পদ, মনোনয়ন, সাংগঠনিক অবস্থান বা রাষ্ট্রীয় সম্পদে প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা হয়, যা রাজনৈতিক প্রতিযোগিতা এবং দলীয় সংগঠনের চরিত্রকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে।

বাংলাদেশের রাজনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে নির্বাচন একটি কেন্দ্রীয় উপাদান হলেও নির্বাচনকে ঘিরে রাজনৈতিক বিরোধ, অবিশ্বাস এবং সংঘাত রাজনৈতিক সংস্কৃতির ওপর গভীর প্রভাব ফেলেছে। নির্বাচনকালীন সরকারব্যবস্থা, নির্বাচনের গ্রহণযোগ্যতা এবং রাজনৈতিক প্রতিযোগিতার সমান সুযোগ নিয়ে দীর্ঘদিনের বিরোধ গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার প্রতি জনআস্থাকে দুর্বল করেছে (জাহান ২০১৫; রিয়াজ, ২০২২)। ফলে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানসমূহের আনুষ্ঠানিক উপস্থিতি অব্যাহত থাকলেও রাজনৈতিক অংশগ্রহণ ও প্রতিনিধিত্বের গুণগত মান, রাজনৈতিক প্রতিযোগিতার কার্যকারিতা এবং নাগরিকদের প্রতি রাজনৈতিক ব্যবস্থার জবাবদিহিতা নিয়ে নানা বিতর্কের উদ্ভব হয়েছে।

তবে বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতি কেবল সংঘাত, মেরুকরণ বা কেন্দ্রীভবনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। নাগরিক সমাজ, গণমাধ্যম, সামাজিক আন্দোলন এবং তরুণ জনগোষ্ঠীর ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক অংশগ্রহণ রাজনৈতিক জবাবদিহি ও সংস্কারের দাবিকে শক্তিশালী করেছে। বিভিন্ন সময় গণতন্ত্র, স্বচ্ছতা, নির্বাচন এবং নাগরিক অধিকার দ্বারা প্রভাবিত আন্দোলনসমূহ রাজনৈতিক ব্যবস্থার ওপর সামাজিক চাপ সৃষ্টি করেছে এবং রাজনৈতিক উন্নয়নের নতুন সম্ভাবনা তৈরি করেছে।

সার্বিকভাবে বলা যায়, বাংলাদেশের রাজনৈতিক উন্নয়নের ধারা একদিকে রাজনৈতিক অংশগ্রহণের সম্প্রসারণ, রাষ্ট্রীয় সক্ষমতার বৃদ্ধি এবং নির্বাচনী রাজনীতির প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের মাধ্যমে অগ্রসর হয়েছে; অন্যদিকে রাজনৈতিক মেরুকরণ, প্রাতিষ্ঠানিক দুর্বলতা, পৃষ্ঠপোষকতাভিত্তিক রাজনীতি এবং দলীয়করণের কারণে এর গণতান্ত্রিক গভীরতা সীমাবদ্ধ থেকেছে। ফলে বাংলাদেশের রাজনৈতিক উন্নয়ন ও রাজনৈতিক সংস্কৃতির চরিত্র মূলত রাজনৈতিক দলসমূহের সংগঠন, পারস্পরিক সম্পর্ক এবং রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার সঙ্গে তাদের মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে নির্ধারিত হয়েছে।

বাংলাদেশে রাজনৈতিক বন্দোবস্ত ও দলীয় শাসনের রূপান্তর

বাংলাদেশের রাজনৈতিক উন্নয়ন, রাজনৈতিক সংস্কৃতি এবং দলীয় রাজনীতির গতিপ্রকৃতি বোঝার জন্য কেবল আনুষ্ঠানিক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান বা নির্বাচনী ব্যবস্থার বিশ্লেষণ যথেষ্ট নয়। রাষ্ট্র, রাজনৈতিক দল, আমলাতন্ত্র, অর্থনৈতিক অভিজাত গোষ্ঠী এবং অন্যান্য প্রভাবশালী সামাজিক শক্তির মধ্যে ক্ষমতার বন্টন ও সম্পর্কের প্রকৃতিও রাজনৈতিক ব্যবস্থার চরিত্র নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই ক্ষমতা বন্টনের সম্পর্ক কাঠামোকে সাধারণত রাজনৈতিক বন্দোবস্ত (political settlement) হিসেবে ব্যাখ্যা করা হয়। রাজনৈতিক বন্দোবস্ত বলতে রাষ্ট্র এবং সমাজের গুরুত্বপূর্ণ শক্তিসমূহের মধ্যে ক্ষমতার ভারসাম্য, সম্পদ বন্টন এবং প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনার তুলনামূলক স্থিতিশীল কাঠামোকে বোঝায়, যা রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক শাসনের ভিত্তি নির্ধারণ করে (খান, ২০১০; নর্থ এবং উইনগাস্ট, ২০০৯)।

রাজনৈতিক বন্দোবস্ত মূলত রাষ্ট্রের সহিংসতা নিয়ন্ত্রণে সক্ষমতা, রাজনৈতিক প্রতিযোগিতার ব্যবস্থাপনা এবং অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধা বন্টনের মাধ্যমে সামাজিক শৃঙ্খলা বজায় রাখে। রাষ্ট্র কাঠামোর সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সুযোগ বন্টনের এই ব্যবস্থা মূলত 'সীমিত-প্রবেশাধিকার (Limited-Access Orders - LAOs) ও উন্মুক্ত-প্রবেশাধিকার (Open-Access Orders - OAOs)' এই দুইটি পদ্ধতিতে বন্টিত হয়। সীমিত-প্রবেশাধিকারভিত্তিক রাজনৈতিক বন্দোবস্তে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধা সীমিত অভিজাত গোষ্ঠীর মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে এবং অভিজাত গোষ্ঠীর মধ্যে সম্পদ ও সুবিধার বন্টনের মাধ্যমে ক্ষমতার

রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ভারসাম্য তৈরির মাধ্যমে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করতে সহায়তা করে। বিপরীতে, উন্মুক্ত-প্রবেশাধিকারভিত্তিক ব্যবস্থায় রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতা তুলনামূলকভাবে প্রতিযোগিতামূলক এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক হয়ে থাকে। উন্মুক্ত-প্রবেশাধিকার রাজনৈতিক বন্দোবস্তে সাধারণত সংগঠন গঠন, রাজনৈতিক অংশগ্রহণ এবং অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ কোনো নির্দিষ্ট গোষ্ঠী বা অভিজাত শ্রেণির একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণে সীমাবদ্ধ থাকে না। রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থা ব্যক্তিগত সম্পদের পরিবর্তে প্রাতিষ্ঠানিক নিয়ম, আইনের শাসন এবং উন্মুক্ত প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে পরিচালিত হয়, যা রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সুযোগের অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত বন্টনকে উৎসাহিত করে (নর্থ, এবং উইনগাস্ট, ২০০৯)।

তবে রাজনৈতিক বন্দোবস্তের বাস্তবতাকে সবসময় এই দ্বৈত কাঠামোর মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। রাজনৈতিক বন্দোবস্তের প্রকৃতি অনেক বেশি জটিল এবং তা মূলত সমাজে বিদ্যমান বিভিন্ন রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক গোষ্ঠীর মধ্যে ক্ষমতার ভারসাম্যের দ্বারা নির্ধারিত হয় (খান, ২০১০)। সুতরাং, রাজনৈতিক বন্দোবস্ত শুধু প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যকারিতার আনুষ্ঠানিক কাঠামোর ওপর নির্ভর করে না; বরং সমাজে অভিজাত শ্রেণি বা গোষ্ঠীদের স্বার্থ, ক্ষমতা এবং পারস্পরিক সম্পর্কের প্রক্রিয়া ও গভীরতার সাথে নিবিড়ভাবে জড়িত। ফলে, সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্কে ওপর প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থার কার্যকারিতা নির্ভর করে। ভিন্ন রাজনৈতিক বাস্তবতায় একই রকম প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ভিন্নভাবে রাজনৈতিক বন্দোবস্তে প্রভাব রাখে। তাই, রাজনৈতিক বন্দোবস্ত কোনো স্থির বা অপরিবর্তনীয় অবস্থা নয়। বরং, রাজনৈতিক বন্দোবস্ত রাষ্ট্র ও সমাজের মধ্যে ক্ষমতা বন্টনের মাধ্যমে সম্পর্কের ধারাবাহিক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে গঠিত একটি গতিশীল প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়ায় কোনো কোনো রাজনৈতিক বন্দোবস্তে উৎপাদনশীল বিনিয়োগ, প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষমতা এবং দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়নকে উৎসাহিত করতে পারে, আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে ক্ষমতা ও সম্পদ দখল এবং স্বার্থ সংরক্ষণকেন্দ্রিক লুণ্ঠনমূলক প্রবণতাও শক্তিশালী হতে পারে (খান, ২০১০)। সুতরাং, একটি দেশের রাজনৈতিক উন্নয়ন, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা এবং গণতান্ত্রিক শাসনের গতিপ্রকৃতি অনেকাংশে বিদ্যমান রাজনৈতিক বন্দোবস্তের প্রকৃতি এবং ক্ষমতার বন্টনের ধরন কতটা অন্তর্ভুক্তিমূলক ও প্রাতিষ্ঠানিকভাবে সুসংগঠিত তার ওপর নির্ভর করে।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে রাজনৈতিক বন্দোবস্তের বিবর্তনকে কয়েকটি স্বতন্ত্র পর্যায়ে বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে রাষ্ট্রগঠন, রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং সামরিক হস্তক্ষেপের ফলে ক্ষমতা কাঠামো বারবার পরিবর্তিত হয়েছে। ১৯৯১ সালে সংসদীয় গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার পর বাংলাদেশের রাজনৈতিক বন্দোবস্ত মূলত বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ও বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল-বিএনপিকে কেন্দ্র করে প্রতিযোগিতামূলক পৃষ্ঠপোষকতাভিত্তিক (competitive clientelist) দলীয় রাজনীতির মাধ্যমে পরিচালিত হয়। এই সময়ে উভয় দল পর্যায়ক্রমে রাষ্ট্রক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে রাষ্ট্রীয় সম্পদ, পৃষ্ঠপোষকতামূলক নেটওয়ার্ক এবং প্রাতিষ্ঠানিক সুযোগ-সুবিধার বন্টনের মাধ্যমে বিভিন্ন রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক অভিজাত (ব্যবসায়ী ও আমলা) গোষ্ঠীর সমর্থন নিশ্চিত করার চেষ্টা করে এবং তাদের স্বার্থে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের ব্যবহার করে (খান, ২০১৩)। এ ধরনের রাজনৈতিক বন্দোবস্ত একদিকে দুর্নীতি, পৃষ্ঠপোষকতাভিত্তিক রাজনীতি এবং প্রাতিষ্ঠানিক দুর্বলতার বিকাশে ভূমিকা রাখলেও, অন্যদিকে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখা এবং ধারাবাহিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির জন্য অনুকূল পরিবেশও সৃষ্টি করে। ফলে দুর্বল সুশাসন, সীমিত প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষমতা এবং উন্নয়ন অগ্রগতির সহাবস্থান বাংলাদেশের রাজনৈতিক অর্থনীতির একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়। বাংলাদেশের রাজনৈতিক শাসন ব্যবস্থা তুলনামূলকভাবে দুর্বল শাসন কাঠামোর মধ্য দিয়ে আর্জিত হওয়া সত্ত্বেও উল্লেখযোগ্য সামাজিক ও অর্থনৈতিক অগ্রগতি অর্জন করতে ক্ষমতার এই সহাবস্থানকে ‘বাংলাদেশ প্যারাদক্স’ বলে বিশ্বে পরিচিতি লাভ করে (হাসান, ২০১৪; লুইস, ২০১১; খান, ২০১৩)।

নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের মাধ্যমে ২০০৯ সালে আওয়ামী লীগের ক্ষমতায় প্রত্যাবর্তনের পর বাংলাদেশের রাজনৈতিক বন্দোবস্তে একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। বিশেষ করে ২০১১ সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বিলুপ্তি এবং ২০১৪, ২০১৮ ও ২০২৪ সালের নির্বাচনকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র ক্রমশ সংকুচিত হতে থাকে। ফলে পূর্ববর্তী প্রতিযোগিতামূলক পৃষ্ঠপোষকতাভিত্তিক রাজনৈতিক বন্দোবস্ত ধীরে ধীরে একচেটিয়া দলীয় (dominant-party settlement) রাজনৈতিক কাঠামোয় রূপান্তরিত হয়। নতুন রাজনৈতিক বন্দোবস্তে মূলত রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান, নির্বাচনী প্রক্রিয়া এবং প্রশাসনিক কাঠামোর ওপর ক্ষমতাসীন দলের আধিপত্য উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায়। পাশাপাশি, সমাজের রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক অভিজাতদের সঙ্গে ক্ষমতা বন্টনের সম্পর্ক ও সমঝোতা বজায় রেখে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার কেন্দ্রীভূত করা হয় এবং এই রাজনৈতিক বন্দোবস্ত অর্থনৈতিক ও সামাজিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে সহায়তা করলেও রাজনৈতিক অন্তর্ভুক্তি ও প্রতিযোগিতাকে সীমিত করেছে (রহমান, ২০১৯)।

এক দলীয় রাজনৈতিক বন্দোবস্ত গড়ে ওঠার ফলে, একদিকে রাজনৈতিক অন্তর্ভুক্তি হ্রাস পেলেও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ও উন্নয়ন কার্যক্রমে ধারাবাহিকতা বজায় থাকে। এ সময়ে সমাজের অভিজাত গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে ক্ষমতা ও সম্পদের বন্টন নিয়ে কার্যকর সমঝোতা বিদ্যমান থাকায় সীমিত রাজনৈতিক প্রতিযোগিতার মধ্যেও অর্থনৈতিকভাবে কার্যকর হয়ে ওঠে (খান, ২০১৩)। তবে, অভিজাতদের নিয়ন্ত্রিত নিষ্কাশনমূলক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে সক্ষম হলেও অর্থনৈতিক বৈষম্য বৃদ্ধি করে এবং তরুণদের জন্য কর্মসংস্থানের সীমিত সুযোগ সৃষ্টি হয়, যার ফলে সামাজিক অস্থিরতার ভিত্তি তৈরি হয় (সাক্সেনা, ২০২২)। একচেটিয়া দলীয় প্রভাবশালী রাজনৈতিক বন্দোবস্ত যে নীপিড়ন ও পৃষ্ঠপোষকতার ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছিলো তার কাঠামোগত দুর্বলতাগুলো বিশেষ করে নির্বাচনী অনিয়ম, ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক বৈষম্য এবং ভিন্নমত প্রকাশের দমন করার নীতির যে চর্চা ছিলো তা ২০২৪ সালের মাঝামাঝি সময়ে ক্রমবর্ধমান জনঅসন্তোষের সঙ্গে মিলিত হয়ে জুলাই অভ্যুত্থানের পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় (আইসিজি, ২০১৯;

হোসেন, ২০২৪)। একদলীয় আধিপত্য আপাত দৃষ্টিতে স্থিতিশীল মনে হলেও মূলত ভঙ্গুর হিসেবে প্রমাণিত হয় যখন ছাত্রসমাজ, সুশীল সমাজের সমন্বিত আন্দোলনের মুখোমুখি হয় (রিয়াজ, ২০২৪)।

২০২৪ সালের আগস্টে শেখ হাসিনা নেতৃত্বাধীন কর্তৃত্ববাদী সরকারের পতন ১৯৯১ সালে গণতন্ত্রের প্রত্যাবর্তনের পর বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত আধিপত্যমূলক রাজনৈতিক বন্দোবস্তে সবচেয়ে বড় এবং তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা হিসেবে চিহ্নিত হয়। শিক্ষার্থী নেতৃত্বাধীন বৈষম্য-বিরোধী আন্দোলন হিসেবে শুরু হওয়ার অল্প কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই পুলিশি বর্বরতা, রাজনৈতিক স্বাধীনতার ওপর বিধিনিষেধ এবং গভীরতর সামাজিক-অর্থনৈতিক অসন্তোষের প্রতিবাদ হিসেবে দেশব্যাপী গণআন্দোলনে পরিণত হয় (রিয়াজ, ২০২৪)। পরবর্তীতে বিরোধী দলসমূহ ও সুশীল সমাজের প্রতিনিধিরা আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার পাশাপাশি সেনাবাহিনীর একাকংশের অব্যাহত দমন-পীড়নকে সমর্থন না করার মাধ্যমে বিদ্যমান শাসনব্যবস্থার পতনকে ত্বরান্বিত করে। গণঅভ্যুত্থান পরবর্তী সময়ে ক্ষমতার শূন্যতা মোকাবিলায় নোবেল বিজয়ী মুহাম্মদ ইউনুসের নেতৃত্বে একটি অন্তর্বর্তী সরকার গঠিত হয় (রিয়াজ, ২০২৪)।

গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতা পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে উদ্ভূত নতুন রাজনৈতিক বন্দোবস্তে ঐতিহাসিকভাবে দুইটি প্রধান রাজনৈতিক দলের অভিজাতদের মধ্যে ক্ষমতার যে দরকষাকষি বা লড়াইয়ের ভারসাম্য বজায় ছিলো তার সামাজিক ভিত্তি সংকীর্ণ হয়েছে একটি বৃহৎ রাজনৈতিক দলের কার্যক্রম নিষিদ্ধ করার মাধ্যমে। ফলে পূর্বের রাজনৈতিক বন্দোবস্তের মত বর্জনমূলক রাজনৈতিক কাঠামো চর্চা বজায় রাখার কারণে মূলত অংশগ্রহণমূলক ও অন্তর্ভুক্তিমূলক রাজনৈতিক বন্দোবস্তের স্থিতিশীলতাকে নমনীয় করে তুলে (হিকি, ২০১৩)। নতুন রাজনৈতিক বন্দোবস্তে সবচেয়ে লক্ষণীয় পরিবর্তন হলো ইসলামপন্থী শক্তির পুনরুত্থান বিশেষ করে বিভিন্ন ইসলামি সংগঠন ও রাজনৈতিক দল পুনরায় সক্রিয় হয়ে রাজনীতিতে প্রভাব বিস্তার করে। নতুন রাজনৈতিক বন্দোবস্তে পূর্বের মতাদর্শিক চরিত্রের বদল হয়ে ধর্মীয় রক্ষণশীল অভিজাত শ্রেণি রাজনৈতিক সমঝোতা ও ক্ষমতা কাঠামোর অংশ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই পরিবর্তনের ফলে সংখ্যালঘু ও ধর্মনিরপেক্ষ গোষ্ঠীগুলো ক্রমবর্ধমান নিরাপত্তাহীনতার ঝুঁকির সম্মুখীন হতে থাকে। (আইসিজি, ২০২৫)। অন্যদিকে, এই পরিবর্তিত রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে সামরিক-নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠানের ভূমিকাও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। অন্তর্বর্তীকালীন সরকার আনুষ্ঠানিকভাবে বেসামরিক নেতৃত্বাধীন হলেও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা, আইন-শৃঙ্খলা এবং গুরুত্বপূর্ণ নীতিগত সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে সামরিক প্রতিষ্ঠানের প্রভাব বিদ্যমান থাকে (আইসিজি, ২০২৪)। রাজনৈতিক ক্ষমতা বেসামরিক ও সামরিক শক্তির সমন্বিত বিন্যাসের মাধ্যমে পরিচালিত হওয়া মূলত 'নিয়ন্ত্রিত গণতন্ত্র বা guarded democracy'-র সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ (লেভিটস্কী এবং ওয়ে, ২০১০)।

বাংলাদেশের রাজনৈতিক উন্নয়নের এই রূপান্তর রাজনৈতিক দলসমূহের সাংগঠনিক চরিত্র এবং রাজনৈতিক সংস্কৃতি উভয়ের ওপরই গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলেছে। রাজনৈতিক প্রতিযোগিতার পরিসর সংকুচিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রাজনৈতিক দলগুলোর অভ্যন্তরীণ গণতন্ত্র, সদস্যভিত্তিক অংশগ্রহণ এবং নেতৃত্বের গণতান্ত্রিক বিকাশের সুযোগও সীমিত হয়েছে। তাই দীর্ঘমেয়াদে একটি স্থিতিশীল ও গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক বন্দোবস্ত প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে রাজনৈতিক দলসমূহের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। রাজনৈতিক দলসমূহকে শুধু ক্ষমতা অর্জন ও পরিচালনার মাধ্যম হিসেবে নয়, বরং রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্ব, অংশগ্রহণ, স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিতকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিকশিত হওয়া প্রয়োজন। রাজনৈতিক বন্দোবস্তের বিবর্তন এবং গণতান্ত্রিক প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের প্রচেষ্টা দীর্ঘমেয়াদে দুর্বল হওয়ার সম্ভাবনা থাকে যদি রাজনৈতিক দলসমূহ অভ্যন্তরীণ গণতান্ত্রিক, অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং জবাবদিহিমূলক সাংগঠনিক সংস্কৃতি গড়ে তুলতে ব্যর্থ হয়। একটি কার্যকর ও টেকসই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ পূর্বশর্ত হচ্ছে রাজনৈতিক দলগুলোর প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা ও অভ্যন্তরীণ গণতন্ত্র।

সুতরাং, বাংলাদেশের রাজনৈতিক বন্দোবস্তের বিবর্তন একদিকে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা, নীতির ধারাবাহিকতা এবং উল্লেখযোগ্য অর্থনৈতিক ও সামাজিক অগ্রগতির জন্য একটি অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। অন্যদিকে রাজনৈতিক প্রতিযোগিতার সংকোচন, ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ, দুর্বল প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ এবং সীমিত জবাবদিহির মতো কাঠামোগত সমস্যাও জন্ম দিয়েছে। ফলে অর্থনৈতিক সাফল্য এবং রাষ্ট্রীয় সক্ষমতার বৃদ্ধি বিশেষ করে গণতান্ত্রিক অংশগ্রহণ, প্রতিনিধিত্ব এবং প্রাতিষ্ঠানিক জবাবদিহির বিকাশ সমান্তরালভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়নি। পাশাপাশি, ২০২৪ সালের রাজনৈতিক পরিবর্তন প্রমাণ করে যে রাজনৈতিক অন্তর্ভুক্তি ও গণতান্ত্রিক বৈধতার ঘাটতি দীর্ঘমেয়াদে কোনো রাজনৈতিক বন্দোবস্তের স্থায়িত্বকে দুর্বল করে তোলে। তাই বাংলাদেশের রাজনৈতিক বন্দোবস্ত প্রধানতম চ্যালেঞ্জ হচ্ছে অন্তর্ভুক্তিমূলক অংশগ্রহণ, প্রাতিষ্ঠানিক জবাবদিহিতা এবং গণতান্ত্রিক প্রতিনিধিত্বের মধ্যে ক্ষমতা ও অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধার টেকসই ভারসাম্য নিশ্চিত করার সক্ষমতা অর্জন করা।

রাজনৈতিক দল, অভ্যন্তরীণ গণতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক সংহতকরণ

রাজনৈতিক দল প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রের অপরিহার্য প্রতিষ্ঠান, যা জনগণ ও রাষ্ট্রের মধ্যে মধ্যস্থতাকারী হিসেবে কাজ করে। রাজনৈতিক নিয়োগ, নীতি প্রণয়ন, নির্বাচনী প্রতিযোগিতা এবং সরকার গঠনের মতো গুরুত্বপূর্ণ কাজ রাজনৈতিক দলসমূহ সম্পাদন করে। তবে, রাজনৈতিক দলগুলোর কার্যকারিতা এবং গণতান্ত্রিক বৈধতা অনেকাংশে নির্ভর করে তারা অভ্যন্তরীণভাবে নিজেদের কার্যক্রম কীভাবে পরিচালনা করে তার ওপর। অভ্যন্তরীণ শাসন বলতে বোঝায় সে সকল নিয়ম-নীতি, কাঠামো এবং প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে দলগুলো নিজেদের দলীয় নেতা নির্বাচন, প্রার্থী মনোনয়ন, অর্থিক ব্যবস্থাপনা, সদস্য অন্তর্ভুক্ত করাসহ সকল কার্যক্রম ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে (স্কারো, ২০০৫)। মূলত রাজনৈতিক দুর্নীতি, প্রভাবশালী গোষ্ঠীর আধিপত্য এবং গণতান্ত্রিক রীতিনীতির ক্ষয় নিয়ে

ক্রমবর্ধমান উদ্বেগের কারণে বিশ্বব্যাপী অভ্যন্তরীণ গণতন্ত্র ও স্বচ্ছতার প্রয়োজনীয়তার দিকে মনোযোগ আকৃষ্ট হয়েছে। রাজনৈতিক দলগুলো তাদের অভ্যন্তরীণ কাঠামোয় স্বৈরাচারী হলে বৃহত্তর রাজনৈতিক ব্যবস্থায়ও কর্তৃত্ববাদী প্রবণতা গড়ে ওঠার সম্ভাবনা থাকে (মিশেলস, ১৯১৫; রাহাত ও হাজান, ২০০১)। সুতরাং, গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া সুসংহত ও শক্তিশালী করার জন্য রাজনৈতিক দলের অভ্যন্তরীণ শাসন ব্যবস্থায় নিয়মিত সংস্কার ও সুশাসন বজায় রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

অভ্যন্তরীণ দলীয় শাসন বলতে সাংগঠনিক নিয়ম, পদ্ধতি এবং ক্ষমতার গতিশীলতাকে বোঝায় যা রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও কার্যক্রম প্রক্রিয়া নির্ধারণ করে। এর মধ্যে নেতৃত্ব নির্বাচন, প্রার্থী মনোনয়ন, দলীয় নীতি প্রণয়ন, বিরোধ নিষ্পত্তি, অভ্যন্তরীণ জবাবদিহি এবং দলীয় আর্থিক ব্যবস্থাপনা অন্তর্ভুক্ত। একটি রাজনৈতিক দল গণতান্ত্রিক নাকি স্বৈরতান্ত্রিক পদ্ধতিতে পরিচালিত হবে তা নির্ধারণ করে এই প্রক্রিয়াগুলো (স্কারো, ২০০৫)। অভ্যন্তরীণ শাসন ব্যবস্থায় আনুষ্ঠানিক দলীয় সংবিধি (গঠনতন্ত্র ও উপবিধি), অনানুষ্ঠানিক প্রথা এবং সাংস্কৃতিক রীতিনীতিও অন্তর্ভুক্ত যা দলের অভ্যন্তরে ক্ষমতার বণ্টন প্রক্রিয়াতে ভূমিকা রাখে। ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট ফর ডেমোক্রেসি অ্যান্ড ইলেক্টরাল অ্যাসিস্টেন্স (আইডিইএ, ২০১৬)-এর প্রতবেদন অনুসারে, শক্তিশালী অভ্যন্তরীণ গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া রাজনৈতিক দলের সদস্যদের নিকট দলের প্রাথমিক দায়বদ্ধতা বা জবাবদিহি নিশ্চিত করে, সেইসাথে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ সমুন্নত রেখে রাজনৈতিক কাঠামোতে কার্যকরভাবে নিজেদের অবস্থান তুলে ধরতে সক্ষম হয় এবং বৃহত্তর রাজনৈতিক পরিসরে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে শক্তিশালী করে।

গণতান্ত্রিকভাবে পরিচালিত একটি রাজনৈতিক দল সমাজের মধ্যে গণতান্ত্রিক নীতিগুলোর প্রতিফলন ঘটায় এবং গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ শক্তিশালী করতে ভূমিকা রাখে। অভ্যন্তরীণ গণতান্ত্রিক চর্চার মাধ্যমে যখন দলের সদস্যরা নেতৃত্ব নির্বাচন, নীতি নির্ধারণী আলোচনা এবং প্রার্থী নির্বাচন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করার সুযোগ পায় তখন তৃণমূল পর্যায়ে গণতান্ত্রিক চর্চা প্রাতিষ্ঠানিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হবার সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়। বিপরীতভাবে, রাজনৈতিক দলগুলোর অভ্যন্তরীণ গণতান্ত্রিক চর্চার ঘাটতি সার্বিকভাবে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার প্রতি জনগণের আস্থা হ্রাস করে (নরিস, ২০০৫)। তাই, কর্তৃত্ববাদী প্রবণতা রোধে অভ্যন্তরীণ গণতন্ত্র চর্চা অপরিহার্য।

একইসাথে অভ্যন্তরীণ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা জবাবদিহি ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার মাধ্যমে দলীয় প্রভাবশালী গোষ্ঠীর উপর নজরদারির কাজ করে। উদাহরণস্বরূপ, দলীয় কার্যক্রমে আর্থিক স্বচ্ছতা অবৈধ তহবিল সংগ্রহকে নিরুৎসাহিত করে এবং জবাবদিহি বৃদ্ধি করে। বিশ্বের অনেক দেশে, রাজনৈতিক দলের অভ্যন্তরীণ আর্থিক তদারকি দুর্বল হবার কারণে দুর্নীতি ও সরকারি সম্পদের অপব্যবহারের উদাহরণ রয়েছে (ওহম্যান, ২০১৪)। সকলে জন্য রাজনৈতিক দলের আর্থিক তথ্য প্রকাশ, নিয়মিত অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা এবং যথাযথ প্রক্রিয়ায় অভ্যন্তরীণ বাজেট বরাদ্দের সিদ্ধান্ত বিশ্বাসযোগ্য ও নৈতিক দল প্রতিষ্ঠার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

সুগঠিত অভ্যন্তরীণ শাসন ব্যবস্থা সাধারণ সদস্যদের অর্থপূর্ণ অংশগ্রহণের সুযোগ প্রদান করে, যা নেতৃত্ব বিকাশ ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাকে সহজ করে। রাহাত ও হাজান (২০০১)-এর মতে অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রার্থী নির্বাচন প্রক্রিয়া দলীয় প্রতিনিধিদের বৈধতা জোরদার করে এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য সুযোগ তৈরি করে। অধিকন্তু, অন্তর্ভুক্তিমূলক অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক পরিবেশ তরুণ সদস্যদের রাজনৈতিক জ্ঞান বৃদ্ধি করাসহ নীতি উদ্ভাবনকে উৎসাহিত করে এবং একটি স্থিতিশীল দলীয় অবকাঠামো গড়ে তুলতে সহায়তা করে। অন্যদিকে, স্পষ্ট সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া, বিরোধ নিষ্পত্তির ব্যবস্থা এবং বিধিবদ্ধ দায়িত্ব সম্পন্ন দলগুলো সংকট মোকাবিলা এবং রাজনৈতিক পরিবর্তনের সাথে মানিয়ে নিতে সক্ষমতা অর্জন করে। অভ্যন্তরীণ সংহতি ও পদ্ধতিগত স্পষ্টতা একটি সুসংহত নির্বাচনী কৌশল ও শাসন কাঠামোয় অবদান রাখে (নরিস, ২০০৫)। অন্যদিকে, সাংগঠনিকভাবে দুর্বল দলগুলো দলীয় কোন্দল, ছবিরতা ও নির্বাচনী অস্থিরতার শিকার হয়।

অন্যদিকে, রাজনৈতিক দলগুলোর অভ্যন্তরীণ গণতান্ত্রিক চর্চার অন্যতম প্রধান চ্যালেঞ্জ হলো দলের নীতি-নির্ধারণী ক্ষমতা একটি নির্দিষ্ট ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর হাতে কেন্দ্রীভূত বা কুক্ষিগত হওয়া, যা দীর্ঘ সময়ে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া ব্যাহত করার মাধ্যমে স্বৈরাচারী বা একনায়কতন্ত্র মনোভাব গড়ে ওঠে এবং বৃহত্তর রাজনৈতিক অঙ্গনে একই ধারার সূচনা হবার ঝুঁকি তৈরি হয় (মিশেলস, ১৯১৫)। রাজনৈতিক দলের অভ্যন্তরীণ ক্ষমতা কুক্ষিগত হবার ঝুঁকি তৈরি হয় যখন দলীয় কার্যক্রম কোনো একক ক্যারিশম্যাটিক নেতৃত্বের ওপর নির্ভরশীলতা গড়ে তোলে, ফলে তারা নিজেদের প্রয়োজনে দলীয় নিয়ম-নীতিকে উপেক্ষা করে এবং দলের মধ্যে যে বা যারা ভিন্নমত পোষণ করে তাদের দলীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করা থেকে বিরত রেখে তাদের দমন করে (স্কারো, ২০০৫; বাউসেক, ২০০৯)।

বিশ্বব্যাপী রাজনৈতিক দলগুলোর অভ্যন্তরীণ গণতান্ত্রিক চর্চা সমুন্নত রাখার ক্ষেত্রে রাজনৈতিক অর্থায়নের স্বচ্ছতা একটি গুরুত্বপূর্ণ দুর্বলতা বা চ্যালেঞ্জ হিসেবে বিবেচিত হয়। আয়ের উৎস, দলীয় এবং নির্বাচনী ব্যয়ের স্বচ্ছতা অর্থদাতাদের স্বার্থকে দলীয় নীতি ও প্রার্থী নির্বাচনের ওপর অসামঞ্জস্যপূর্ণ নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখার সুযোগ করে দেয় (ওহম্যান, ২০১৪)। ফলে, অপরাধে স্বচ্ছতা প্রায়শই "অর্থ দাও, সুযোগ নাও" ধরনের আত্মসী নেতিবাচক ব্যবস্থার দিকে ধাবিত করে, যেখানে মেধাভিত্তিক নেতৃত্ব ও প্রতিনিধিত্বমূলক সিদ্ধান্ত গ্রহণের পরিবর্তে রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতা ও মুকন্দী-মক্কেল সম্পর্ক গড়ে ওঠে। আর্থিক কর্মকাণ্ডের স্বচ্ছ প্রক্রিয়ায় পরিচালনার কারণে দলগুলো তাদের বৃহত্তর সদস্যভিত্তিক নির্ভরতার পরিবর্তে ব্যক্তিগত অনুদান দাতাদের স্বার্থের কাছে জিম্মি হবার ঝুঁকি থাকে, যা গণতান্ত্রিক জবাবদিহিতাকে দুর্বল করে (ফিশার, ২০১৩)। রাজনৈতিক দলের অভ্যন্তরীণ গণতান্ত্রিক চর্চার একটি বড় দিক হলো জাতি-ধর্ম-বর্ণ-লিঙ্গ পরিচয় ভেদে সকলের অংশগ্রহণ করার সমান সুযোগ রাখা। কিন্তু বাস্তবে, রাজনৈতিক দলগুলো প্রায়শই নেতৃত্ব ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় নারী ও যুবকদের প্রান্তিক করে রাখে যা অন্তর্ভুক্তির বাগম্বরপূর্ণ প্রতিশ্রুতির নির্দেশক। রাজনৈতিক দলগুলো

মূলত নির্বাচনী বা আইনি বাধ্যবাধকতা পূরণের জন্য নারী বা যুবদের দলীয় কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করে, কিন্তু এই ব্যবস্থাগুলো প্রায়শই নাম মাত্র বা দুর্বলভাবে বাস্তবায়ন করা হয় (ড্রুক, ২০১০; ইউএনডিপি, ২০২০)।

বাংলাদেশের দলীয় রাজনীতিতে পৃষ্ঠপোষকতাভিত্তিক (patron-client) সম্পর্ক এবং ব্যক্তিনির্ভর রাজনৈতিক সংস্কৃতিও অভ্যন্তরীণ গণতন্ত্রের বিকাশকে প্রভাবিত করেছে। রাজনৈতিক আনুগত্য, ব্যক্তিগত নেটওয়ার্ক এবং ক্ষমতাকেন্দ্রিক সংগঠন অনেক ক্ষেত্রে নীতিভিত্তিক বিতর্ক এবং অংশগ্রহণমূলক সিদ্ধান্ত গ্রহণের সংস্কৃতিকে দুর্বল করেছে। এর ফলে দলীয় সংগঠনের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ বাধাগ্রস্ত হয়েছে এবং নতুন নেতৃত্ব বিকাশের সুযোগও সীমিত হয়েছে। একই সঙ্গে রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার উচ্চমাত্রার মেরুকরণ দলগুলোর ভেতরে ভিন্নমত প্রকাশের ক্ষেত্রেও সংকুচিত করেছে। তবে সাম্প্রতিক সময়ে রাজনৈতিক দলগুলোর গণতান্ত্রিক সংস্কার, স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহি নিয়ে আলোচনা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। নাগরিক সমাজ, গণমাধ্যম এবং তরুণ প্রজন্মের রাজনৈতিক অংশগ্রহণ রাজনৈতিক দলগুলোর সাংগঠনিক কাঠামো ও কার্যক্রমে অধিকতর স্বচ্ছতা এবং অন্তর্ভুক্তির দাবি জোরদার করেছে। গণতান্ত্রিক সুসংহতকরণ কেবল নির্বাচন আয়োজন বা সাংবিধানিক কাঠামো প্রতিষ্ঠার বিষয় নয়; বরং রাজনৈতিক দলগুলোর অভ্যন্তরীণ গণতান্ত্রিক রূপান্তরের সঙ্গেও গভীরভাবে সম্পর্কিত।

সুতরাং, উল্লিখিত আলোচনায় থেকে বলা যায় যে, অভ্যন্তরীণ গণতান্ত্রিক চর্চা রাজনৈতিক দলগুলোর জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ; কারণ, শক্তিশালী রাজনৈতিক দলের উপস্থিতি বৃহত্তর গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক চর্চা সুসংহত করে। রাজনৈতিক দলগুলোতে স্বচ্ছতা, অন্তর্ভুক্তিতা এবং জবাবদিহির অভাব কেবল তাদের রাজনৈতিক বৈধতাই ক্ষুণ্ণ করে না বরং গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোকেও দুর্বল করে। অভ্যন্তরীণ গণতান্ত্রিক চর্চা বজায় রাখার জন্য আনুষ্ঠানিক নিয়কানুনের পাশাপাশি দলগুলোর মধ্যে সামাজিক পরিবর্তনের সাথে মানিয়ে নেওয়া জন্য দলীয় সাংস্কৃতিক পরিবর্তন, সহায়ক আইনি পরিবেশ এবং নাগরিক সমাজসহ ভোটারদের সক্রিয় অংশগ্রহণ প্রয়োজন।

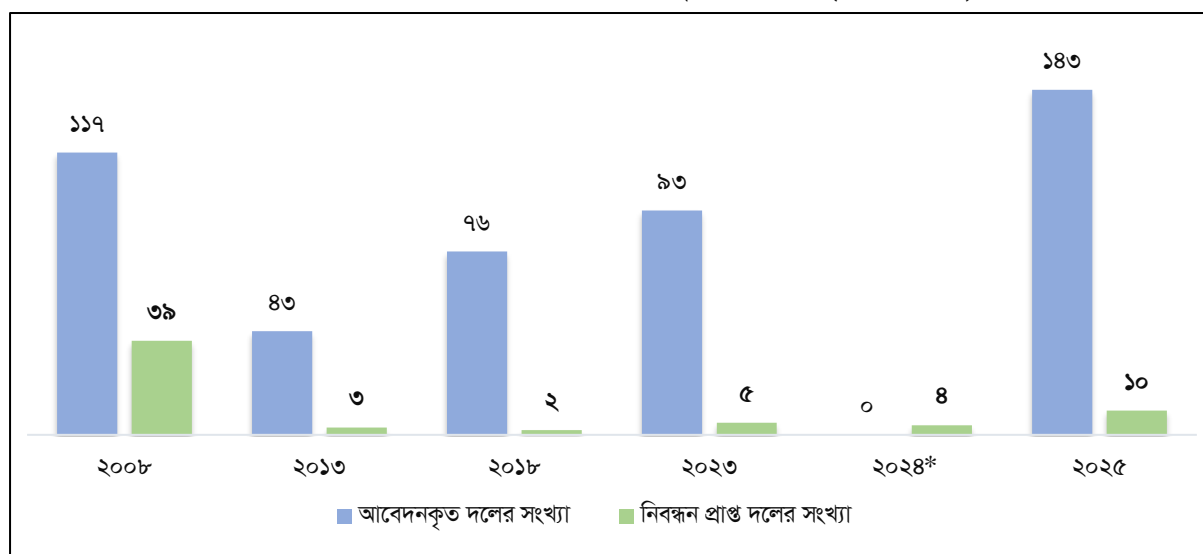
অধ্যায় ৩: বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলসমূহ

বাংলাদেশে রাজনৈতিক দলগুলো গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার অন্যতম প্রধান অংশীজন হিসেবে রাজনৈতিক সচেতনতা ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় বিভিন্ন সময়ে কার্যকর ভূমিকা পালন করেছে। নির্বাচনী ব্যবস্থাকে প্রাতিষ্ঠানিক ও নিয়ন্ত্রিত কাঠামোর আওতায় আনার লক্ষ্যে ২০০৮ সালে বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন রাজনৈতিক দলসমূহের জন্য নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার ক্ষেত্রে নিবন্ধন গ্রহণ বাধ্যতামূলক করে (ইইউ, ২০০৮)। এই উদ্যোগের মাধ্যমে রাজনৈতিক দলগুলোর সাংগঠনিক কাঠামো, গঠনতন্ত্র, আর্থিক স্বচ্ছতা ও অভ্যন্তরীণ গণতান্ত্রিক চর্চা নিশ্চিত করার প্রচেষ্টা করা হয়।

২০০৮ সাল থেকে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার ক্ষেত্রে রাজনৈতিক দলের নিবন্ধন গ্রহণ বাধ্যতামূলক করার পর থেকে বিভিন্ন সময়ে মোট ৬৩টি রাজনৈতিক দল নিবন্ধন লাভ করেছে। তবে নির্ধারিত আইনগত শর্ত পূরণে ব্যর্থ হওয়ায় ৩টি রাজনৈতিক দলের নিবন্ধন বাতিল করা হয়। পাশাপাশি, সরকার কর্তৃক একটি রাজনৈতিক দলের কার্যক্রম নিষিদ্ধ ঘোষিত হওয়ায় সংশ্লিষ্ট দলের নিবন্ধন স্থগিত করা হয়। সে হিসেবে বাংলাদেশে বর্তমান নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলের সংখ্যা ৫৯টি।

বাংলাদেশে কতগুলো অনিবন্ধিত রাজনৈতিক দল রয়েছে সে বিষয়ে সঠিক তথ্য পাওয়া যায় না। তবে ২০০৮ সাল থেকে বিভিন্ন সময়ে নিবন্ধনের জন্য আবেদন করা দলের সংখ্যা থেকে অনিবন্ধিত রাজনৈতিক দলের সংখ্যার একটি ধারণা পাওয়া যায় (চিত্র ১)। চিত্র অনুযায়ী, ২০০৮ সালে নিবন্ধনের জন্য সর্বমোট ১১৯টি দলের আবেদনের প্রেক্ষিতে ৩৯টি দল নিবন্ধন লাভ করে। অন্যদিকে, ২০১৩ সালে আবেদনের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত কম লক্ষ করা যায় - ৪৩টি রাজনৈতিক দলের আবেদনের প্রেক্ষিতে ৩টি দল নিবন্ধন লাভ করে। ২০১৮ সালে ৭৬টি আবেদন জমা পড়ে এবং ২টি দল নিবন্ধন পায়। ২০২৩ সালে আবেদনের সংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও (৯৩টি) নিবন্ধন প্রাপ্ত দলের সংখ্যা ছিল ৫টি। ২০২৪ সালে কোনো দল আবেদন না করলেও, আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর পূর্বে আবেদন করা ৪টি দল নিবন্ধন লাভ করে। রাজনৈতিক দল নিবন্ধনের ক্ষেত্রে ২০২৫ সাল একটি উল্লেখযোগ্য বছর হিসেবে চিহ্নিত হয়। এ বছরে সর্বাধিক ১৪৩টি নতুন রাজনৈতিক দল নিবন্ধনের জন্য আবেদন জমা দেয় (নির্বাচন কমিশন, ২০২৫)। তবে নির্বাচন কমিশন মাঠ পর্যায়ের তথ্য যাচাই ও প্রাথমিক মূল্যায়নের পর ২২টি দলকে প্রাথমিকভাবে বাছাই করে। পরবর্তীতে চূড়ান্ত পর্যালোচনার মাধ্যমে ৪টি রাজনৈতিক দল নিবন্ধন লাভ করে। এছাড়া, এবছর পূর্বে নিবন্ধনের জন্য আবেদন করা আরও ৬টি রাজনৈতিক দলকে নিবন্ধন প্রদান করা হয়।

চিত্র ১: রাজনৈতিক দল নিবন্ধনের আবেদন ও অনুমোদনের সংখ্যা (২০০৮-২০২৫)



* ২০২৪ সালে নিবন্ধনের জন্য কোনো দল আবেদন করেনি, তবে পূর্বে আবেদন করা ৪টি দলকে নিবন্ধন দেওয়া হয়। ২০২৫ সালে নিবন্ধন পাওয়া দলগুলোর মধ্যে ৬টি দলকে পূর্বের আবেদনের ভিত্তিতে নিবন্ধন দেওয়া হয়।

ওপরের চিত্র থেকে প্রতীয়মান হয় যে, বিগত তিনটি জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পূর্বে নিবন্ধনের জন্য আবেদন করা দলগুলোর মধ্যে ৭৪টি থেকে ১৩৯ রাজনৈতিক দল নিবন্ধনের জন্য আবেদন করলেও নিবন্ধন পাওয়ার ক্ষেত্রে বিদ্যমান আইনি শর্ত পূরণ করতে না পারার কারণে নিবন্ধন পায়নি। এর বাইরে কিছু অঞ্চলভিত্তিক রাজনৈতিক দল রয়েছে, এসব দলের কার্যক্রম দুই-একটি জেলার মধ্যে সীমিত এবং নির্বাচন কমিশনের নিবন্ধিত নয়।

বাংলাদেশে নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলের সংখ্যা ৬৩টি হলেও ২০০৮ সাল থেকে ২০২৬ পর্যন্ত পাঁচটি জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ২০টি রাজনৈতিক দল জাতীয় সংসদে প্রতিনিধিত্ব করতে সক্ষম হয়েছে। নির্বাচন সংক্রান্ত তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, বিগত পাঁচটি জাতীয় নির্বাচনে ৫ থেকে ৯টি রাজনৈতিক দলের মনোনীত প্রার্থী নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে জাতীয় সংসদে প্রতিনিধিত্ব করতে

পেরছে। এর মধ্যে ২০২৬ সালের নির্বাচনে সর্বাধিক নয়টি দলের বিজয়ী প্রার্থীগণ জাতীয় সংসদে প্রতিনিধিত্ব করছে। তবে ৫-৯টি দল জাতীয় সংসদে প্রতিনিধিত্ব করতে পারলেও মূলত দুটি প্রধান রাজনৈতিক দল এবং উক্ত দলের নেতৃত্বাধীন জোট জাতীয় সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনের মাধ্যমে সরকার গঠন করতে সক্ষম হয়েছে। বাংলাদেশে সংসদীয় রাজনীতিতে দ্বিদলীয় আধিপত্য (quasi two-party dominance) গড়ে উঠেছে, যেখানে অন্যান্য ছোট ও মাঝারি রাজনৈতিক দলগুলো সীমিত ভূমিকা পালন করতে পারে।

সারণি ৩: জাতীয় নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী দল ও সংসদে প্রতিনিধিত্বকারী দলের সংখ্যা (২০০৮-২০২৬)

সংসদ নির্বাচন	অংশগ্রহণকারী দল	সংসদে প্রতিনিধিত্বকারী দল
৯ম সংসদ নির্বাচন (২০০৮)	৩৯টি	৮টি
১০ম সংসদ নির্বাচন (২০১৪)	১২টি	৭টি
১১শ সংসদ নির্বাচন (২০১৮)	৩৯টি	৮টি
১২শ সংসদ নির্বাচন (২০২৪)	২৮টি	৫টি
১৩শ সংসদ নির্বাচন (২০২৬)	৫০টি	৯টি

মতাদর্শের ভিত্তিতে বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে প্রধানত তিনটি ধরন লক্ষ করা যায়—জাতীয়তাবাদী বা মধ্যপন্থী মতাদর্শ, সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শ এবং ধর্মীয় মতাদর্শ। এই মতাদর্শগত বিভাজন রাজনৈতিক দলগুলোর কর্মসূচি, সাংগঠনিক কাঠামো, রাজনৈতিক অবস্থান এবং রাষ্ট্র পরিচালনা বিষয়ে দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রভাবিত করে থাকে। বাংলাদেশের জাতীয়তাবাদী মতাদর্শভিত্তিক বা মধ্যপন্থী রাজনৈতিক দলগুলো সাধারণত জাতীয় সার্বভৌমত্ব, রাষ্ট্রীয় পরিচয়, রাজনৈতিক ঐক্য এবং স্বাধীনতা-সংশ্লিষ্ট আদর্শকে গুরুত্ব প্রদান করে। এসব দল রাজনৈতিক বাস্তবতায় তুলনামূলকভাবে বৃহৎ জনসমর্থন অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে এবং সংসদীয় রাজনীতিতে দীর্ঘদিন ধরে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শভিত্তিক দলগুলো রাষ্ট্রীয় সম্পদের ন্যায্য বণ্টন, সামাজিক ন্যায্যবিচার, শ্রেণি বৈষম্য হ্রাস এবং শ্রমজীবী মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার ওপর জোর দেয়। তবে বাংলাদেশের রাজনৈতিক বাস্তবতায় এসব দলের সাংগঠনিক সক্ষমতা ও ভোটভিত্তিক প্রভাব তুলনামূলকভাবে সীমিত থাকায় তারা জাতীয় পর্যায়ে প্রভাবশালী ভূমিকা রাখতে পারেনি। ধর্মীয় মতাদর্শভিত্তিক রাজনৈতিক দলগুলো ধর্মীয় মূল্যবোধ, নৈতিকতা এবং ধর্মানুগ রাষ্ট্রব্যবস্থার ধারণাকে রাজনৈতিক কর্মসূচির কেন্দ্রে স্থাপন করে। এসব দল সময়ভেদে রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট অনুযায়ী সক্রিয় ভূমিকা পালন করলেও জাতীয় সংসদে প্রতিনিধিত্ব ও সরকার গঠনে তাদের প্রভাব সীমিত পর্যায়েই রয়ে গেছে। সার্বিকভাবে, এই তিন ধরনের মতাদর্শ বাংলাদেশে রাজনৈতিক বহুত্ববাদের প্রতিফলন ঘটালেও বাস্তবে ক্ষমতা ও প্রতিনিধিত্বের ক্ষেত্রে জাতীয়তাবাদী মতাদর্শভিত্তিক দলগুলোই আধিপত্য বিস্তার করেছে।

অধ্যায় ৪: রাজনৈতিক দলের প্রাতিষ্ঠানিক সুশাসন

রাজনৈতিক দলের প্রাতিষ্ঠানিক সুশাসন বলতে দলগুলোর এমন সাংগঠনিক ব্যবস্থা ও চর্চাকে বোঝায় যেখানে রাষ্ট্রীয় আইন ও বিধিবিধান, দলীয় গঠনতন্ত্র ও শৃঙ্খলাবিধি এবং সাংগঠনিক নিয়ম মেনে দলের বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা, গণতান্ত্রিক উপায়ে প্রতিযোগিতামূলক ও অংশগ্রহণমূলক নেতৃত্ব নির্বাচন, অংশগ্রহণমূলক সিদ্ধান্ত গ্রহণ, নেতৃত্বের কর্মকাণ্ডের জবাবদিহি এবং সাংগঠনিক সিদ্ধান্তের ব্যাখ্যা প্রদান করা, দলীয় কার্যক্রমে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা, নারী, সংখ্যালঘু ও প্রান্তিক গোষ্ঠীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করাকে বোঝায়। এই গবেষণায় সুশাসনের বিভিন্ন নির্দেশক তথা আইনি কাঠামো, অভ্যন্তরীণ গণতন্ত্র চর্চা, অংশগ্রহণ ও অন্তর্ভুক্তি, স্বচ্ছতা, জবাবদিহি ও অনিয়ম-দুর্নীতি আলোকে গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত রাজনৈতিক দলের প্রাতিষ্ঠানিক সুশাসন পর্যালোচনা করা হয়েছে। গবেষণায় সুশাসনের প্রতিটি নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ চিহ্নিত হয়েছে, যা এই অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে।

রাজনৈতিক দল গঠন ও পরিচালনাসংশ্লিষ্ট আইনি কাঠামো

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৩৮ অনুচ্ছেদে প্রত্যেক নাগরিককে সংগঠন বা সমিতি করার অধিকার প্রদান করা হয়েছে। যার ভিত্তিতে বাংলাদেশের যে কোনো ব্যক্তি বা দল কোনো রাজনৈতিক দল গঠনের অধিকার রাখে। তবে রাজনৈতিক দল গঠন ও এর কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণের জন্য ১৯৭৮ সালে ‘দ্য পলিটিক্যাল পার্টি অর্ডিন্যান্স, ১৯৭৮’ প্রণয়ন করা হয়। এই অধ্যাদেশে দল গঠন করার ক্ষেত্রে কিছু বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়। যার মধ্যে রয়েছে বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব, অখণ্ডতা ও নিরাপত্তাবিরোধী রাজনৈতিক দল গঠন; বিদেশি-সহায়তাপুষ্ট রাজনৈতিক দল গঠন; গোপন রাজনৈতিক কার্যক্রম ও সশস্ত্র ক্যাডারভিত্তিক দল গঠনের ক্ষেত্রে বিধিনিষেধ আরোপ করা। এছাড়া এই অধ্যাদেশে রাজনৈতিক দলের তহবিলকে ব্যাংকিং ব্যবস্থার নিয়ে আসা হয়। এই অধ্যাদেশে আরও রয়েছে কোনো দল এসব বিধান লঙ্ঘন করছে বলে সরকারের কাছে প্রতীয়মান হলে সরকার বিষয়টি হাইকোর্ট বিভাগে পাঠাতে পারবে এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা পক্ষের বক্তব্য শুনে হাইকোর্ট বিভাগ উক্ত বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত প্রদান করতে পারবে। তবে জনস্বার্থে প্রয়োজন মনে করলে সরকার গেজেট আদেশ প্রকাশের মাধ্যমে হাইকোর্টের সিদ্ধান্ত না হওয়া পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক দলের কার্যক্রম সাময়িকভাবে স্থগিত রাখতে নির্দেশ দিতে পারবে। যদি হাইকোর্ট বিভাগ এই মর্মে সিদ্ধান্ত প্রদান করে যে, কোনো রাজনৈতিক দল উল্লিখিত বিধিবিধান লঙ্ঘন করেছে, তাহলে উক্ত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক দল বিলুপ্ত বলে গণ্য হবে এবং দলটির সকল সম্পদ ও তহবিল সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত হবে। তবে এই অধ্যাদেশে রাজনৈতিক দলের নিবন্ধন, দলীয় কার্যক্রম পরিচালনা বিশেষত অভ্যন্তরীণ গণতন্ত্র চর্চা, প্রার্থী মনোনয়ন, নারীর প্রতিনিধিত্ব, রাজনৈতিক অর্থায়নে স্বচ্ছতা, বা জবাবদিহি নিশ্চিত করার মতো বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি।

সারণি ৪: রাজনৈতিক দলের কার্যক্রম পরিচালনা সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধিমালাসমূহ

ক্রম	সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধিমালা
১.	গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান
২.	গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ (Representation of the People Order, 1972-RPO)
৩.	দি পলিটিক্যাল পার্টিস অর্ডিন্যান্স (The Political Parties Ordinance), ১৯৭৮
৪.	রাজনৈতিক দল নিবন্ধন বিধিমালা, ২০০৮

পরবর্তীতে নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় আইনগত শৃঙ্খলা ও জবাবদিহি প্রতিষ্ঠা করা; কোন রাজনৈতিক দল নিবন্ধনের যোগ্য হবে তার একটি সুস্পষ্ট কাঠামো নির্ধারণ করা; রাজনৈতিক দলের সাংগঠনিক কাঠামো ও কার্যকরতা যাচাই করা; অভ্যন্তরীণ গণতান্ত্রিক চর্চা নিশ্চিত করা; নেতৃত্ব নির্বাচন ও প্রার্থী মনোনয়নের প্রাতিষ্ঠানিক প্রক্রিয়া প্রতিষ্ঠা করা; দলীয় কাঠামোতে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধির লক্ষ্য নির্ধারণ করা; সংবিধান ও রাষ্ট্রীয় মৌলিক নীতির পরিপন্থী, বৈষম্যমূলক বা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিবিরোধী দলকে নিবন্ধনের আওতার বাইরে রাখা ইত্যাদি বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা এবং একই সঙ্গে নিবন্ধন প্রদান, তথ্য যাচাই, ধারাবাহিক তদারকি এবং প্রয়োজনবোধে নিবন্ধন বাতিলের মাধ্যমে নির্বাচন কমিশন-এর নিয়ন্ত্রক ভূমিকার জন্য একটি আইনগত ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করতে ২০০৮ সালে ‘গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২’-এর সংশোধন এবং ‘রাজনৈতিক দল নিবন্ধন বিধিমালা, ২০০৮’ প্রণয়ন করা হয়। তবে আরপিও, ১৯৭২ এবং বিধিমালা ২০০৮-এ বেশ কিছু সীমাবদ্ধতা ও প্রায়োগিক চ্যালেঞ্জ পরিলক্ষিত হয়েছে।

রাজনৈতিক দলের নিবন্ধন গ্রহণে আইনি চ্যালেঞ্জ

বাংলাদেশে ২০০৮ সালে গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২-এ কিছু গুরুত্বপূর্ণ সংশোধন করার মাধ্যমে জাতীয় নির্বাচনে অংশগ্রহণে প্রথমবারের মতো রাজনৈতিক দলের নিবন্ধন গ্রহণ বাধ্যতামূলক করা হয়। গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ সংশোধনের মাধ্যমে ধারা ৯০(খ) ও ৯০(গ) সংযোজন করা হয় এবং রাজনৈতিক দল নিবন্ধনের শর্তাবলি ও দলীয় গঠনতন্ত্রে অন্তর্ভুক্ত করতে কিছু বিষয় নির্ধারণ করা হয়। গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ সংশোধনের মাধ্যমে রাজনৈতিক দলসমূহকে নিবন্ধন গ্রহণ, বার্ষিক নিরীক্ষিত আয়-ব্যয়ের হিসাব দাখিল, গঠনতন্ত্র অনুযায়ী নির্বাচনের মাধ্যমে কমিটি গঠন এবং নির্বাচনী আচরণবিধি পরিপালনের বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হয়। বিদ্যমান

আইন ও বিধি অনুসারে বাংলাদেশে বহুদলীয় রাজনৈতিক পরিবেশ ও প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্র চর্চায় দলগুলোর সক্রিয় অংশগ্রহণের সুযোগ থাকলেও, দলগুলোর প্রাতিষ্ঠানিক পরিচালনা ও অভ্যন্তরীণ সুশাসন নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে আইনি কাঠামো এবং আইন পরিপালনে ঘাটতি রয়েছে।

বাংলাদেশে কোনো রাজনৈতিক দল নিবন্ধনের আহ্বান হলে আরপিও, ১৯৭২-এর ধারা ৯০(খ)(১)(ক)-এ মূলত দুই ধরনের শর্ত আরোপ করা হয়। পূর্বের কোনো নির্বাচনে সুনির্দিষ্ট সফলতা অর্জন বা সুনির্দিষ্ট সাংগঠনিক কাঠামো থাকার শর্ত পূরণসাপেক্ষে দলগুলোকে নিবন্ধনের জন্য আবেদন করতে হয়। এই শর্তগুলোর মধ্যে রয়েছে-

- “বাংলাদেশ স্বাধীন হইবার পর হইতে অনুষ্ঠিত সংসদ নির্বাচনে দলীয় নির্বাচনী প্রতীক লইয়া কমপক্ষে একটি আসন লাভ করতে হবে।”
- “উপরোক্ত সংসদ নির্বাচনের যে কোনো একটিতে উক্ত দলের প্রার্থী কর্তৃক নির্বাচনে অংশগ্রহণকৃত আসনে প্রদত্ত মোট ভোটের শতকরা পাঁচ ভাগ ভোট লাভ করতে হবে।”
- কেন্দ্রীয় কমিটিসহ একটি সক্রিয় কেন্দ্রীয় অফিস, উহা যে নামেই অভিহিত হউক না কেন, অনূন এক তৃতীয়াংশ প্রশাসনিক জেলায় কার্যকর জেলা অফিস এবং অনূন একশতটি উপজেলা বা, ক্ষেত্রমত, মেট্রোপলিটন থানায় অফিস প্রতিষ্ঠা করতে হবে যাহার প্রত্যেকটিতে সদস্য হিসাবে নূনতম দুইশত ভোটারের তালিকাভুক্তি করতে হবে।”

নিবন্ধন শর্তগুলো পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, নির্বাচনী সাফল্য সংক্রান্ত উল্লিখিত প্রথম শর্ত দুইটি কেবল ২০০৮ সালের পূর্ববর্তী নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী রাজনৈতিক দলগুলোর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। ২০০৮ সালের পরের গঠিত নতুন দলগুলোর পক্ষে যেহেতু নিবন্ধন ছাড়া নিজ দলীয় প্রতীকে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা সম্ভব নয় সেহেতু আইনের এই শর্ত নতুন দলের পক্ষে পূরণ করা সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে নতুন দলগুলোর জন্য কঠোর ও জটিল সাংগঠনিক কাঠামো বিষয়ক তৃতীয় শর্তটি অর্থাৎ কেন্দ্রীয় পর্যায়, এক তৃতীয়াংশ প্রশাসনিক জেলা ও একশতটি উপজেলা পর্যায় অফিস থাকা এবং প্রতিটি পর্যায় দুইশত ভোটার থাকা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। ২০০৮ সালের পূর্বে নির্বাচনে জাতীয় সংসদের একটি আসনে বিজয়ী হওয়া বা যে কোনো একটি আসনের মোট ভোটের পাঁচ শতাংশ ভোট পাওয়া দলগুলোর এই সংখ্যক কার্যালয় বা ভোটার না থাকলেও তারা নিবন্ধন পেয়েছে। আইনের এই শর্ত নতুন করে গঠিত দলের জন্য বৈষম্যমূলক এবং একই সঙ্গে এই শর্ত দলগুলোর ওপর আর্থিক বোঝা তৈরি করেছে। সেইসাথে শর্তটি নতুন দলগুলোকে পরোক্ষভাবে জাতীয় নির্বাচনে প্রতিযোগিতা করা এবং রাজনৈতিক অধিকার চর্চার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করেছে। অন্যদিকে এই সাংগঠনিক কাঠামো নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহে দলগুলোর ব্যবসায়ী ও বিত্তশালী গোষ্ঠীর উপর নির্ভরতা তৈরির ঝুঁকি সৃষ্টি করেছে। এছাড়াও বিদ্যমান রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে রাজনৈতিক প্রতিহিংসার ভয়ে অনেক সময় নতুন দলগুলো নতুন কোনো এলাকায় দলীয় কার্যালয় স্থাপন ও স্বাভাবিক সাংগঠনিক কার্যক্রম পরিচালনা করতে চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে হয় এবং অনেক ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট দলের কর্মী-সমর্থকরা তাদের কর্মী পরিচয় প্রকাশ করতে দ্বিধাবোধ করে এবং পরিচয় গোপন করে যা নির্বাচন কমিশন কর্তৃক মাঠ পর্যায়ের দলীয় কার্যক্রম ও ভোটার যাচাই প্রক্রিয়াকে বাধাগ্রস্ত বা বিলম্বিত করে।

রাজনৈতিক দলের নিবন্ধন গ্রহণে আর্থিক চ্যালেঞ্জ

বাংলাদেশে রাজনৈতিক দল হিসেবে নিবন্ধন প্রক্রিয়ার অন্যতম বড় চ্যালেঞ্জ হলো নিবন্ধন সাংগঠনিক কাঠামো বিষয়ক শর্ত পূরণে বড় অঙ্কের আর্থিক ব্যয়। নতুন রাজনৈতিক দলের নিবন্ধন প্রাপ্তির ক্ষেত্রে সাংগঠনিক কাঠামো ও ভৌগলিক বিস্তৃতি সংক্রান্ত আইনি শর্তাবলি পূরণ করা দলগুলোর জন্য বড় ধরনের আর্থিক চ্যালেঞ্জ তৈরি করে যা একই সাথে রাজনীতি এবং জাতীয় নির্বাচনে ‘এন্ট্রি ব্যারিয়ার’ সৃষ্টি করেছে। গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে রক্ষণশীলভাবে প্রাক্কলিত হিসাব অনুযায়ী, আইনি বাধ্যবাধকতা মেনে একটি নতুন রাজনৈতিক দলের নিবন্ধন পাওয়ার শর্তাবলি পূরণ করতে অর্থাৎ কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় পর্যায়ের অফিস ভাড়া, আসবাবপত্র, প্রয়োজনীয় দলিল এবং অন্যান্য সরঞ্জাম খরচ বাবদ নূনতম ৩৩ লাখ টাকা থেকে ৭৬ লাখ টাকা পর্যন্ত প্রয়োজন। রাজনৈতিক অঙ্গনে নতুন ও উদীয়মান দলগুলোর জন্য শুরুতেই এত বিপুল অঙ্কের অর্থ যোগাড় করা অত্যন্ত দুরূহ ও জটিল। ফলে নিবন্ধনের এই আইনি শর্ত নতুন রাজনৈতিক দলগুলোর বিকাশে প্রতিবন্ধকতা হিসেবে কাজ করে।

নতুন রাজনৈতিক দলের নিবন্ধন প্রাপ্তির সাংগঠনিক শর্ত পূরণে নূনতম ৩৩ লাখ থেকে ৭৬ লাখ টাকা (প্রাক্কলিত) প্রয়োজন

সারণি ৫: রাজনৈতিক দলের নিবন্ধন শর্ত পূরণে প্রয়োজনীয় প্রাক্কলিত অর্থ

ক্রম	ব্যয়ের খাত	মূল্য (টাকা)	সংখ্যা	অফিসের সংখ্যা	ব্যয়ের পরিমাণ (টাকা)
কেন্দ্রীয় অফিস স্থাপন					
১.	অফিস ভাড়া (কমপক্ষে ৩ মাসের)**	১০,০০০-১৫,০০০	৩	১	৩০,০০০ - ৪৫,০০০
২.	অফিসের অগ্রিম বাবদ (কমপক্ষে ৩ মাসের)**	১০,০০০-১৫,০০০	৩	১	৩০,০০০ - ৪৫,০০০

ক্রম	ব্যয়ের খাত	মূল্য (টাকা)	সংখ্যা	অফিসের সংখ্যা	ব্যয়ের পরিমাণ (টাকা)
৩.	চুক্তিপত্র প্রণয়ন ও প্রস্তুত (এককালীন)	৫০০	১	১	৫০০
৪.	টেবিল (এককালীন)	১,৫০০ - ২,০০০	৩	১	৪,৫০০ - ৬,০০০
৫.	চেয়ার (এককালীন)	৫০০	২০-৩০	১	১০,০০০ - ১৫,০০০
৬.	নামফলক বা সাইনবোর্ড (এককালীন)	৫০০ - ১,০০০	১	১	৫০০ - ১,০০০
৭.	বৈদ্যুতিক ফ্যান ও লাইট (এককালীন)	৫,০০০ - ১০,০০০	১	১	৫,০০০ - ১০,০০০
	মোট				৮০,৫০০ - ১,২২,৫০০
	প্রকাশনা ও মুদ্রণ				
৮.	সদস্য ফর্ম মুদ্রণ (এককালীন)	১৫,০০০ - ৩০,০০০	১	১	১৫,০০০ - ৩০,০০০
৯.	রশিদ, গঠনতন্ত্র ইত্যাদি মুদ্রণ (এককালীন)	৫,০০০ - ১০,০০০	১	১	৫,০০০ - ১০,০০০
	মোট				২০,০০০ - ৪০,০০০
স্থানীয় অফিস স্থাপন (২২টি জেলায়)					
১০.	অফিস ভাড়া (কমপক্ষে ৩ মাসের)**	৩,০০০ - ১০,০০০	৩	২২	১,৯৮,০০০ - ৬,৬০,০০০
১১.	অফিসের অগ্রিম (কমপক্ষে ৩ মাসের)**	৩,০০০ - ১০,০০০	৩	২২	১,৯৮,০০০ - ৬,৬০,০০০
১২.	চুক্তিপত্র প্রণয়ন ও প্রস্তুত	৫০০	১	২২	১১,০০০
১৩.	টেবিল (এককালীন)	৮০০ - ১,০০০	৩	২২	৫২,৮০০ - ৬৬,০০০
১৪.	চেয়ার (এককালীন)	৪০০ - ৫০০	২০	২২	১,৭৬,০০০ - ২,২০,০০০
১৫.	নামফলক বা সাইনবোর্ড (এককালীন)	৫০০ - ১,০০০	১	২২	১১,০০০ - ২২,০০০
১৬.	বৈদ্যুতিক ফ্যান ও লাইট বাবদ (এককালীন)	৫,০০০ - ১০,০০০	১	২২	১,১০,০০০ - ২,২০,০০০
	মোট				৭,৫৬,৮০০ - ১৮,৫৯,০০০
স্থানীয় অফিস স্থাপন (১০১টি উপজেলা/মহানগরে)					
১৭.	অফিস ভাড়া (কমপক্ষে ৩ মাসের)**	২,০০০ - ৫,০০০	৩	১০১	৬,০৬,০০০ - ১৫,১৫,০০০
১৮.	অফিসের অগ্রিম বাবদ (কমপক্ষে ৩ মাসের)**	২০০০ - ৫০০০	৩	১০১	৬,০৬,০০০ - ১৫,১৫,০০০
১৯.	চুক্তিপত্র প্রণয়ন ও প্রস্তুত (এককালীন)	৫০০	১	১০১	৫০,৫০০
২০.	টেবিল (এককালীন)	৫০০ - ১,০০০	৩	১০১	১,৫১,৫০০ - ৩,০৩,০০০
২১.	চেয়ার (এককালীন)	৩০০ - ৫০০	২০	১০১	৬,০৬,০০০ - ১০,১০,০০০
২২.	নামফলক বা সাইনবোর্ড (এককালীন)	৫০০ - ১,০০০	১	১০১	৫০,৫০০ - ১,০১,০০০
২৩.	বৈদ্যুতিক ফ্যান ও লাইট বাবদ (এককালীন)	৩০০০ - ১০০০০	১	১০১	৩,০৩,০০০ - ১০,১০,০০০
	মোট				২৩,৭৩,৫০০ - ৫,৫০,৮৫০০
নিবন্ধনের জন্য আবেদন সংক্রান্ত (এককালীন)					
২৪.	নিবন্ধন ফি (এককালীন)	৫,০০০	১	১	৫,০০০
২৫.	কেন্দ্রীয় কমিটির তালিকা, সদস্যদের ফর্ম, অফিস ভাড়ার চুক্তিপত্র ইত্যাদি নথিপত্রের অনুলিপি প্রস্তুত	৩০,০০০ - ৫০,০০০	১	১	৩০,০০০ - ৫০,০০০
	মোট				৩৫,০০০ - ৫৫,০০০
	সর্বমোট				৩২,৬৫,৮০০ - ৭৫,৮১,০০০

*নতুন নিবন্ধিত বা নিবন্ধনের জন্য আবেদন করা রাজনৈতিক দলের কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত ভিত্তিক নিবন্ধন ব্যয় চিত্র

**অফিসের স্থান ও আয়তনভেদে ব্যয় পরিবর্তনশীল

রাজনৈতিক দলগুলোর প্রাতিষ্ঠানিক স্বকীয়তা অর্জন ও কাঠামোগত ভিত্তি গড়ে তোলার ক্ষেত্রে এই বিপুল অর্থের প্রয়োজনীয়তা নিবন্ধন প্রত্যাশী রাজনৈতিক দলগুলোর ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। নিবন্ধনের পূর্বশর্ত হিসেবে সাংগঠনিক কার্যক্রমের বিস্তৃত করার শর্তের কারণে নিবন্ধন প্রত্যাশী রাজনৈতিক দলগুলোকে দীর্ঘমেয়াদি ব্যয় বহন করার বাধ্যবাধকতা রাজনৈতিক প্রতিযোগিতাকে অর্থনৈতিক সক্ষমতার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত করেছে। ফলে তৃণমূলভিত্তিক, আন্দোলননির্ভর বা আদর্শের ভিত্তিতে গঠিত রাজনৈতিক দলগুলোর রাজনৈতিক প্রতিযোগিতায় প্রবেশ করতে ন্যূনতম প্রায় ৩৩ লক্ষ টাকা ব্যয়ের সক্ষমতা অর্জন করতে হয়। এই ব্যয় দীর্ঘসময় ধরে বহন করা নবগঠিত রাজনৈতিক দলের পক্ষে প্রায় অসম্ভব এবং যা দলগুলোর রাজনৈতিক অংশগ্রহণ সংকুচিত করে।

ফলে নিবন্ধন প্রত্যাশী রাজনৈতিক দলগুলোর আইনি শর্ত পূরণের এই বিপুল ব্যয় সংকুলান করতে শুরুতেই ব্যবসায়ী, শিল্পপতি ও বিত্তশালী ব্যক্তিদের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ার ঝুঁকি তৈরি হয় এবং দলের ওপর বিত্তশালীদের প্রভাব বিস্তারের সুযোগ তৈরি হয়। এই পরিস্থিতিতেই রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে অর্থ ও পেশিজ্ঞান ব্যবহার করে দল প্রতিষ্ঠা ও সহজে নিবন্ধন প্রাপ্তির প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। অনেক ক্ষেত্রে নীতি-আদর্শের তোয়াক্কা না করে কেবল অর্থ ও পেশিজ্ঞানের জোরে নতুন রাজনৈতিক দল গঠন করে প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি নেওয়ার প্রচেষ্টা দেখা যায়। সাম্প্রতিক সময়ে, গ্রাহকের অর্থ আত্মসাৎ করা ও সাজাপ্রাপ্ত একটি ব্যবসায়িক গ্রুপের কর্তৃপক্ষ মাত্র দুই-তিন মাসের প্রাতিষ্ঠানিক প্রস্তুতি নিয়ে রাজনৈতিক দল গঠন করে এবং নির্বাচন কমিশন থেকে এই দলের প্রাথমিক নিবন্ধনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। যদিও পরবর্তীতে নানা বিতর্ক, গণআন্দোলন এবং প্রবল আপত্তির মুখে নির্বাচন কমিশন সেই নিবন্ধন প্রদান না করার সিদ্ধান্ত নেয়। রাজনৈতিক দল নিবন্ধন প্রক্রিয়ায় এমন ঘটনা বিদ্যমান আইনি কাঠামোতে আর্থিক সক্ষমতা নিবন্ধন প্রক্রিয়ায় যে সুবিধা সৃষ্টি করে তার একটি দৃষ্টান্ত।

উল্লিখিত বিশ্লেষণের ভিত্তিতে বলা যায় যে, বাংলাদেশের রাজনৈতিক দল নিবন্ধনের আইনি শর্তভিত্তিক বর্তমান ব্যবস্থাটি অর্থনির্ভর প্রতিযোগিতামূলক মক্কেলবাদ (competitive clientelism) তৈরি করেছে। তাই নিবন্ধন প্রত্যাশী রাজনৈতিক দলগুলো নিজেদের আদর্শ, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের চেয়ে দলীয় কার্যক্রম পরিচালনা ও অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্য ব্যবসায়ী ও বিত্তশালী পৃষ্ঠপোষকদের ওপর নির্ভরশীল হতে বাধ্য হয়। বাংলাদেশে রাজনৈতিক দল নিবন্ধনের প্রক্রিয়া কেবল একটি প্রশাসনিক ধাপ নয়; বরং রাজনৈতিক প্রতিযোগিতা নিয়ন্ত্রণের একটি কাঠামোগত বাধ্যস্বরূপ। তাই, রাজনৈতিক দল নিবন্ধন প্রক্রিয়ার কাঠামোগত শর্ত মূলত রাজনৈতিক বহুত্ববাদ, সমতা এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক গণতন্ত্রের উদ্দেশ্য এবং চেতনাকে ক্ষুণ্ণ করে।

রাজনৈতিক দল নিবন্ধনের শর্ত সম্পর্কিত বৈশ্বিক/আন্তর্জাতিক চর্চা

রাজনৈতিক দলের আইনী স্বীকৃতি ও নিবন্ধনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন দেশে স্বকীয় আইনি কাঠামো ও শর্তাবলি বিদ্যমান রয়েছে। বাংলাদেশের পার্শ্ববর্তী তিনটি দেশ এবং উপমহাদেশের বাইরে একটি দেশের রাজনৈতিক দলের নিবন্ধনসংশ্লিষ্ট বিধিবিধান পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, বাংলাদেশে নিবন্ধন প্রাপ্তির শর্ত তুলনামূলকভাবে পার্শ্ববর্তী দেশসমূহের তুলনায় কঠোর ও ব্যয়বহুল। পার্শ্ববর্তী দেশগুলোতে রাজনৈতিক দলের নিবন্ধন প্রাপ্তির অন্যতম শর্ত দলের গঠনতন্ত্র ও কেন্দ্রীয় কমিটির উপস্থিতি হলেও বাংলাদেশে বিস্তৃত সাংগঠনিক কাঠামো বা পূর্ববর্তী জাতীয় নির্বাচনে দলের সাফল্যকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। নিম্নে কয়েকটি দেশের নিবন্ধন শর্তের সাথে বাংলাদেশের নিবন্ধনের শর্তেও তুলনামূলক বিশ্লেষণ তুলে ধরা হলো-

সারণি ৬: বিশ্বের বিভিন্ন দেশে রাজনৈতিক দল নিবন্ধনের শর্তাবলী

দেশ	নিবন্ধনের শর্ত
বাংলাদেশ	আরপিও, ১৯৭২ -এ বর্ণিত সুস্পষ্ট বিধানসহ দলের গঠনতন্ত্র, দলের লোগো ও পতাকার ছবি, কেন্দ্রীয় কমিটি, দলের তহবিলের উৎসের বিবরণ, দলের নামে ব্যাংক হিসাব, এবং পূর্ববর্তী নির্বাচনী সাফল্য (পূর্বের জাতীয় নির্বাচনে দলীয় প্রতীকে অন্তত ১টি আসন লাভ/ কোনো সংসদীয় আসনে প্রদত্ত মোট ভোটের অন্তত ৫ শতাংশ ভোট প্রাপ্তি) অথবা শক্তিশালী সাংগঠনিক কাঠামোর (কেন্দ্রীয় অফিসসহ ১/৩ প্রশাসনিক জেলায় ও অন্যান্য ১০০টি উপজেলা/মেট্রোপলিটন থানায় কার্যকর অফিস এবং প্রতিটিতে ন্যূনতম ২০০ জন ভোটারের সদস্য হিসেবে তালিকাভুক্তি) উপস্থিতি
ভারত	দলের গঠনতন্ত্র, কেন্দ্রীয় কমিটি, অন্তত ১০০ জন সদস্য ও কেন্দ্রীয় কার্যালয় থাকা এবং দল গঠনের ৩০ দিনের মধ্যে নির্বাচন কমিশনে আবেদন দাখিল
শ্রীলংকা	দলের গঠনতন্ত্র, ঘোষণাপত্র ও ইশতেহার, অন্তত একজন নারী সদস্যসহ কেন্দ্রীয় কমিটির তালিকা, নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন এবং ধারাবাহিকভাবে সক্রিয় রাজনৈতিক কার্যক্রম পরিচালনার প্রমাণ
নেপাল	সমাজে বিভাজন সৃষ্টি করে দলের এমন নাম, প্রতীক বা পতাকা না থাকা; নিয়মিতভাবে কমিটি নির্বাচনের বিধানসহ গণতান্ত্রিক গঠনতন্ত্র ও বিধিমালা; ঘোষণাপত্র; কেন্দ্রীয় কমিটি ও কার্যালয়; তহবিল সংগ্রহ পদ্ধতি; নিবন্ধন প্রাপ্তি পরবর্তী সময়ে নির্বাচনে অংশগ্রহণের জন্য ১০,০০০ ভোটারের স্বাক্ষর জমাদান
যুক্তরাজ্য	রাজনৈতিক দলের কেন্দ্রীয় কমিটি, কেন্দ্রীয় অফিস ও দলীয় গঠনতন্ত্র থাকা

উৎস: সংশ্লিষ্ট দেশের নির্বাচন কমিশনের ওয়েবসাইট ও অন্যান্য প্রাসঙ্গিক নথি পর্যালোচনা।

পার্ব্বতী দেশ ভারতের আইনী কাঠামো অনুযায়ী, একটি রাজনৈতিক দলকে নিবন্ধিত হতে হলে দলের নিজস্ব গঠনতন্ত্র, কেন্দ্রীয় কমিটি, দলে ন্যূনতম ১০০ জন সদস্য এবং একটি সুনির্দিষ্ট কেন্দ্রীয় কার্যালয় থাকতে হয়। এছাড়া দল গঠনের ৩০ দিনের মধ্যে নির্বাচন কমিশনে নিবন্ধনের জন্য আবেদন দাখিলের বাধ্যবাধকতা রয়েছে। অন্যদিকে শ্রীলঙ্কায় রাজনৈতিক দল নিবন্ধনের শর্তাবলি আরো বিস্তারিত ও সুনির্দিষ্ট; সেখানে দলের গঠনতন্ত্র, ঘোষণাপত্র ও ইশতেহার দাখিলের পাশাপাশি কেন্দ্রীয় কমিটিতে অন্তত একজন নারী সদস্যের উপস্থিতি বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। একই সাথে নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন জমা দেওয়া এবং ধারাবাহিকভাবে সক্রিয় রাজনৈতিক কার্যক্রম পরিচালনার প্রমাণ উপস্থাপন করা শ্রীলঙ্কায় নিবন্ধনের প্রধান শর্ত হিসেবে কাজ করে।

দক্ষিণ এশিয়ার অপর দেশ নেপালে রাজনৈতিক দলের নিবন্ধনে সামাজিক সংহতি ও অভ্যন্তরীণ গণতন্ত্রকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। সেখানে সমাজে বিভাজন সৃষ্টি করতে পারে-দলের এমন কোনো নাম, প্রতীক বা পতাকা ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। এর পাশাপাশি নেপালের এসংশ্লিষ্ট আইনে নিয়মিতভাবে কমিটি নির্বাচনের বিধানসংবলিত একটি গণতান্ত্রিক গঠনতন্ত্র ও বিধিমালা, ঘোষণাপত্র, কেন্দ্রীয় কমিটি ও কার্যালয় স্থাপন এবং সুস্পষ্ট তহবিল সংগ্রহ পদ্ধতি প্রদর্শন করার বিধান রয়েছে। নিবন্ধন লাভের পর নির্বাচনে অংশগ্রহণের জন্য উক্ত দলের ১০,০০০ ভোটারের স্বাক্ষর জমা দেওয়ার শর্তও সেখানে কার্যকর রয়েছে। ভারতীয় উপমহাদেশের বাইরে যুক্তরাজ্যে রাজনৈতিক দল নিবন্ধনের আইনী পদ্ধতিটি তুলনামূলকভাবে সহজ ও মৌলিক কাঠামোর ওপর নির্ভরশীল; যেখানে মূলত দলের একটি কেন্দ্রীয় কমিটি, কেন্দ্রীয় অফিস এবং একটি অনুমোদিত দলীয় গঠনতন্ত্র থাকাই নিবন্ধনের প্রাথমিক শর্ত হিসেবে বিবেচিত হয়।

রাজনৈতিক দল নিবন্ধনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশে বিদ্যমান আইনি শর্ত দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশের তুলনায় অধিক কঠোর এবং সাংগঠনিক সক্ষমতা নির্ভর নিবন্ধন প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হয়। বাংলাদেশ নিবন্ধনের পূর্বশর্ত হিসেবে বিস্তৃত সাংগঠনিক কাঠামো ও নির্বাচনী সক্ষমতাকে অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলের প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি শক্তিশালী হওয়ার সম্ভাবনা থাকলেও রাজনৈতিক প্রতিযোগিতা ও নতুন দলের বিকাশের সুযোগ তুলনামূলকভাবে সীমিত হওয়ার ঝুঁকি বিদ্যমান।

রাজনৈতিক দলের নিবন্ধন প্রক্রিয়া সংক্রান্ত আইনি সীমাবদ্ধতা

গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (আরপিও), ১৯৭২-এর ধারা ৯০ঙ(২)-এ

“কোনো রাজনৈতিক দলের নিবন্ধনের দরখাস্ত নাকচ করা হইলে, পনেরো কার্য দিবসের মধ্যে, কমিশন উহা, লিখিতভাবে, সংশ্লিষ্ট দলকে অবহিত করিবে”

এই মর্মে নির্বাচন কমিশনের ওপর বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হলেও দরখাস্ত নাকচ করার সুনির্দিষ্ট কারণ লিখিতভাবে জানানোর কোনো স্পষ্ট বাধ্যবাধকতা আইনে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। নির্বাচন কমিশন নিবন্ধনের জন্য আবেদনকৃত দলগুলোর মধ্যে থেকে বাতিল হওয়া দলগুলোর একটি তালিকা প্রকাশ করলেও, দলগুলোর নিবন্ধন আবেদন বাতিল করার কারণ উল্লেখ করে না। ফলে গোটা নিবন্ধন প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত হয় না, যা সামগ্রিকভাবে নির্বাচন কমিশন এবং রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রতি সকল অংশীজনের আস্থা ও গ্রহণযোগ্যতা বিনষ্ট হওয়ার ঝুঁকি সৃষ্টি করে।

রাজনৈতিক দলের নিবন্ধন প্রক্রিয়ায় অনিয়ম ও রাজনৈতিক প্রভাব

কয়েকটি দলের নিবন্ধন প্রদানে সরকারি হস্তক্ষেপ ও দলীয় প্রভাব বিস্তারের অভিযোগ ওঠে। একাধিক তথ্যদাতা জানিয়েছেন যে, বিভিন্ন সময়ে রাষ্ট্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার মাধ্যমে সরকারি হস্তক্ষেপে কিছু রাজনৈতিক দলের নিবন্ধন প্রদান করা হয়েছে। অন্যদিকে, নিবন্ধনের জন্য প্রয়োজনীয় শর্ত পূরণ করা সত্ত্বেও কয়েকটি দল দীর্ঘসূত্রতা, প্রশাসনিক জটিলতা কিংবা প্রত্যাখ্যানের সম্মুখীন হয়েছে এবং পরবর্তীতে আদালতের মাধ্যমে নিবন্ধন লাভ করেছে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, ২০২২ সালের মে মাসে নির্বাচন কমিশন নতুন রাজনৈতিক দলের নিবন্ধনের জন্য আবেদন আহ্বান করে। নিবন্ধন পেতে ৯৩টি দল আবেদন করে। প্রাথমিক বাছাইয়ে ১৮টি আবেদন বাতিলের সুপারিশ করা হয় ও ২টি প্রত্যাহার করা হয়। নির্বাচন কমিশন ১৫ দিন সময় দিয়ে ৭৭টি দলকে বিস্তারিত নথি প্রদানের নোটিশ প্রদান করে। পরবর্তীতে এই দলগুলোর মধ্যে ১২টি দলকে প্রাথমিকভাবে বাছাই করা হয় এবং তবে মাঠ পর্যায়ে তথ্যের গরমিলের যুক্তিতে ১০টি দলকে নিবন্ধন দেওয়া হয়নি। অন্যদিকে সরকারের হস্তক্ষেপ বা প্রভাবে ‘কিংস পার্টি’ হিসেবে অভিহিত বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী আন্দোলন (বিএনএম) এবং বাংলাদেশ সুপ্রিম পার্টি (বিএসপি) নামে দুইটি নতুন দলকে নির্বাচন কমিশন নিবন্ধন প্রদান করে। যদিও দল দুইটির স্থানীয় পর্যায়ে অফিস না থাকা, মাঠ পর্যায়ে তথ্য সঠিকভাবে যাচাই-বাছাই না করাসহ নিবন্ধনের শর্ত পূরণ এবং যোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। অপরদিকে কয়েকটি দলের যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও সরকারি প্রভাবে ‘মাঠ পর্যায়ে তথ্যের গরমিলের যুক্তিতে’ নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে নিবন্ধন না দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে (টিআইবি, ২০২৪)। এসব দৃষ্টান্ত নতুন রাজনৈতিক দলের নিবন্ধন বিষয়ে নির্বাচন কমিশনের নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন তৈরি করে। নিবন্ধন প্রক্রিয়া স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণের বিষয়ে আইনি অস্পষ্টতার কারণে এই সরকারি হস্তক্ষেপের সুযোগ তৈরি হয়েছে।

অন্যদিকে স্থানীয় পর্যায়ে দলীয় কার্যালয়, সাংগঠনিক কাঠামো এবং নিবন্ধনের অন্যান্য শর্ত সরেজমিনে পরিদর্শনের সময় আর্থিক লেনদেনের অভিযোগ পাওয়া গিয়েছে, যদিও এসব অভিযোগের প্রাতিষ্ঠানিক প্রমাণ দুরূহ। এ বিষয়ে নির্বাচন কমিশনের একজন তথ্যদাতা উল্লেখ করেন যে-

“কিছু ক্ষেত্রে (নিবন্ধন সংক্রান্ত) আর্থিক লেনদেন হয়েছে, তবে সেটা ‘নাস্তা’ পর্যায়ে নাকি ‘ট্রেডিং (নিবন্ধন বাণিজ্য)’ সেটা নিশ্চিত না।”

সামগ্রিকভাবে রাজনৈতিক দলের নিবন্ধন ব্যবস্থা একটি গুরুত্বপূর্ণ গণতান্ত্রিক প্রাতিষ্ঠানিক প্রক্রিয়া হলেও এর বাস্তবায়নে অনিয়ম, অস্বচ্ছতা, অনানুষ্ঠানিক আর্থিক লেনদেন এবং রাজনৈতিক প্রভাবের অভিযোগ বিদ্যমান।

আরপিও, ১৯৭২-এর ধারা ৯০জজ(১)(অ)-এ বলা হয়েছে-

“নির্বাচন কমিশন কোন নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলের নিবন্ধন স্থগিত করিতে পারিবে এবং তাহার জন্য সংরক্ষিত প্রতীক অব্যবহার্য রাখিতে পারিবে, যতক্ষণ না উহা প্রত্যাহার করা হয়, যদি- সরকার কর্তৃক উক্ত দলের রাজনৈতিক কর্মকান্ড স্থগিত করা হয়।”

আইনের এই ধারা দলের নিবন্ধন প্রক্রিয়ায় নির্বাচন কমিশনের ক্ষমতার ওপর প্রত্যক্ষ সরকারি বা নির্বাহী হস্তক্ষেপের একটি সুযোগ তৈরি করে দেয়। নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলের কার্যক্রম স্থগিত করার ক্ষমতা সরকারের হাতে ন্যস্ত থাকায় নির্বাচন কমিশনের ক্ষমতা সংকুচিত হয়। উপরন্তু, সরকার কর্তৃক রাজনৈতিক দলের কার্যক্রম নিষিদ্ধ বা স্থগিত করার ভিত্তিতে নির্বাচন কমিশন কর্তৃক উক্ত দলের নিবন্ধন বাতিল কিংবা স্থগিতকরণের এই ব্যবস্থা ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দল কর্তৃক উদ্দেশ্যমূলকভাবে প্রতিপক্ষ দলকে দমন বা তাদেরকে জাতীয় নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা থেকে বিরত রাখার হাতিয়ার হিসেবে এই আইনের অপব্যবহারের সুযোগ রয়েছে। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ‘দ্য পলিটিক্যাল পার্টি অর্ডিন্যান্স, ১৯৭৮’-এ আইন লঙ্ঘনের কারণে কোনো রাজনৈতিক দল বিলুপ্তির ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট দলের বক্তব্য যাচাই সাপেক্ষে হাইকোর্ট বিভাগ চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। যদিও আরপিও তে সরাসরি সরকারি সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নির্বাচন কমিশন কর্তৃক কোনো দলের নিবন্ধন বাতিল বা স্থগিত করা হয়।

রাজনৈতিক দলের আর্থিক ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত আইনি চ্যালেঞ্জ

রাজনৈতিক দলগুলোর অনুদান গ্রহণ ও আর্থিক লেনদেনের ক্ষেত্রে আরপিও, ১৯৭২-এ কয়েকটি মৌলিক বিধান নির্ধারণ করা রয়েছে। আরপিও, ১৯৭২-এর ধারা ৯০চ(১)(ক)-এ বলা হয়েছে-

“কোনো নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল- অনুচ্ছেদ ৪৪গগ এর দফা (১) এ বর্ণিত উৎস ব্যতিরেকে, কোনো ব্যক্তি, কোম্পানি, গ্রুপ অব কোম্পানি বা বেসরকারি সংস্থা হইতে দান বা অনুদান বা সম্পদ বা সেবা গ্রহণ করিতে পারিবে; তবে শর্ত থাকে যে, উক্তরূপ দান বা অনুদান বা সম্পদ বা সেবার মূল্য নিম্নবর্ণিত সীমা অতিক্রম করিবে না: কোনো পঞ্জিকা বৎসরে, একজন ব্যক্তি বা কোম্পানি বা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে, পঞ্চাশ লক্ষ টাকা বা উহার সমমানের কোনো সম্পদ বা সেবা; তবে আরও শর্ত থাকে যে, উক্ত দান বা অনুদান বা সম্পদ বা সেবার মূল্য পঞ্চাশ হাজার টাকা বা তদধিক হইলে, উহার ব্যাংকিং চ্যানেলের মাধ্যমে গ্রহণ করিতে হইবে এবং উক্ত দান বা অনুদান বা সম্পদ বা সেবা প্রদানকারী ব্যক্তির ট্যাক্স রিটার্নে প্রদর্শন করিতে হইবে”।

আরপিও’র এই ধারাতে ৫০ হাজার টাকার অধিক অনুদান ব্যাংকের মাধ্যমে লেনদেন করা এবং দাতার আয়কর রিটার্নে তা প্রদর্শনের বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হলেও অনুদানের মূল উৎস রাজনৈতিক দল কর্তৃক প্রকাশ করা কিংবা নির্বাচন কমিশন কর্তৃক এসব তথ্য স্বাধীনভাবে যাচাই-বাছাই করার কোনো স্পষ্ট বিধান রাখা হয়নি। এছাড়া, নির্দিষ্ট কিছু প্রতিষ্ঠান-যেমন রাষ্ট্রায়ত্ত্ব সংস্থা বা সরকারের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ কোনো বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান-থেকে অনুদান গ্রহণ করা যাবে কিনা সে বিষয়েও সংশ্লিষ্ট ধারায় সুস্পষ্ট করা হয়নি। ফলে, অনুদান গ্রহণে বিশেষ করে ক্ষমতায় থাকা দলের ক্ষেত্রে স্বার্থের দ্বন্দ্ব তৈরির ঝুঁকি সুযোগ রয়েছে। সেইসাথে অনুদান প্রদানে প্রকৃত মালিকানা (বেনিফিসিয়াল ওউনারশিপ) প্রকাশ বা যাচাইয়ের সুযোগ না থাকায় একই ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান থেকে বিভিন্ন নামে একাধিক অনুদান গ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

আরপিও’তে, যেকোনো বিদেশি রাষ্ট্র, বিদেশি অনুদানপুষ্ট এনজিও বা বিদেশি নাগরিকদের নিকট থেকে রাজনৈতিক দলের অনুদান বা উপহার গ্রহণ সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। আরপিও, ১৯৭২-এর ধারা ৯০চ(২) বলা হয়েছে-

“কোনো নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল কোনো বিদেশি রাষ্ট্র বা বিদেশি সাহায্যপুষ্ট কোনো বেসরকারি সংস্থা বা জন্মসূত্রে বাংলাদেশি নহেন এইরূপ কোনো ব্যক্তি বা তৎকর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বা পরিচালিত কোনো সংস্থার নিকট হইতে কোনো উপহার, দান, অনুদান বা অর্থ গ্রহণ করিতে পারিবে না”।

এই নিষেধাজ্ঞা থাকা সত্ত্বেও, রাজনৈতিক দলগুলো প্রকৃতপক্ষে বিদেশি উৎস থেকে অপ্রত্যক্ষভাবে বা ভিন্ন উপায়ে কোনো আর্থিক সহায়তা গ্রহণ করছে কি না, তা যাচাই করার কোনো বিধান নেই, যা দলগুলোকে বিদেশি উৎস থেকে গোপনে অনুদান গ্রহণের সুযোগ তৈরির ঝুঁকি সৃষ্টি হয়েছে।

রাজনৈতিক অর্থায়নে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিতকরণ সংক্রান্ত আইনি সীমাবদ্ধতা

রাজনৈতিক দল নিবন্ধন বিধিমালা, ২০০৮-এ রাজনৈতিক দলগুলোর আর্থিক স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিতকরণে কিছু আইনি ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়। প্রথমত, উক্ত বিধিমালার বিধি ৬(চ)-এ “দলের নামে রক্ষিত ব্যাংক-একাউন্ট নম্বর ও ব্যাংকের নাম এবং উক্ত একাউন্টের সর্বশেষ স্থিতি” সংক্রান্ত তথ্য দলের নিবন্ধনের আবেদনের সাথে জমা দেওয়ার বাধ্যবাধকতা থাকলেও, দলের সব পর্যায়ের প্রতিটি লেনদেন বাধ্যতামূলকভাবে ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে পরিচালনার বিষয়ে বিধিমালাতে সুনির্দিষ্ট কোনো বিধান নেই। পাশাপাশি,

ডিজিটাল অর্থ লেনদেনের মাধ্যম, যেমন মোবাইল আর্থিক সেবা (এমএফএস)-এর মাধ্যমে লেনদেন সম্পাদন করার বিষয়ে কোনো বিধানও এই বিধিমালাতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। এক্ষেত্রে রাজনৈতিক দলগুলো সাধারণত কেবল কেন্দ্রীয় পর্যায়ের আংশিক/সীমিত লেনদেন ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে সম্পাদন করে থাকে। দলের মাঠপর্যায় থেকে শুরু করে প্রায় প্রতিটি স্তরে বিপুল পরিমাণের অনানুষ্ঠানিক ও নগদ অর্থ লেনদেনের সুযোগ তৈরি হয়, যা রাজনৈতিক অর্থায়নের অস্বচ্ছ ও অনানুষ্ঠানিক লেনদেনের পরিবেশকে উৎসাহিত করছে।

রাজনৈতিক দল নিবন্ধন বিধিমালা, ২০০৮-এর বিধি ৯(খ)-এ “প্রতি বৎসর ৩১ শে জুলাই এর মধ্যে অব্যবহিত পূর্বের পঞ্জিকা বৎসরের সংশ্লিষ্ট দলের আর্থিক লেনদেন একটি রেজিস্টার্ড চার্টার্ড একাউন্টিং ফার্ম দ্বারা অডিট করা ইয়া অডিট রিপোর্টের একটি কপি কমিশনে দাখিল” বাধ্যতামূলক করা হলেও বিধিমালাতে দলের সকল পর্যায়ের (যেমন জেলা, উপজেলা বা তৃণমূল পর্যায়) আর্থিক লেনদেনের হিসাব যথাযথভাবে সংরক্ষণ এবং কমিশনে জমা দেওয়ার সুস্পষ্ট আইনি বিধান নেই। সেইসাথে, নির্বাচন কমিশনে নিবন্ধিত দল কর্তৃক নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন যথাসময়ে ও নিয়মিত দাখিলের বাধ্যবাধকতা থাকলেও, জমাকৃত আর্থিক প্রতিবেদন নির্বাচন কমিশন কর্তৃক নিরপেক্ষভাবে ‘যাচাই’ বা জনসাধারণের জন্য সহজলভ্য ও অনুসন্ধানযোগ্য আকারে জনসমক্ষে ‘প্রকাশ’ করার সুনির্দিষ্ট বিধান নেই। ফলে, রাজনৈতিক দলগুলো সর্বস্তরের আয়-ব্যয়ের হিসাব যথাযথভাবে তাদের দাখিলকৃত আর্থিক প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত করে না, যা দলগুলোর স্বচ্ছতা নিশ্চিত প্রতিবন্ধকতা তৈরির সুযোগ সৃষ্টি করছে। অন্যদিকে আইনি বাধ্যবাধকতা না থাকায় নির্বাচন কমিশনও রাজনৈতিক দলগুলোর জমাকৃত আর্থিক প্রতিবেদনসমূহ স্বাধীনভাবে যাচাই করে না, বা সাধারণ জনগণের জ্ঞাতার্থে এগুলো জনসম্মুখে প্রকাশ করে না। সার্বিকভাবে আইনের এই অস্পষ্টতা রাজনৈতিক দলের আর্থিক জবাবদিহিকে নামমাত্র আনুষ্ঠানিকতায় পর্যবসিত হয়েছে এবং দলের আর্থিক স্বচ্ছতা নিশ্চিত বড় ধরনের বাধার সৃষ্টি করছে।

সামগ্রিকভাবে, বাংলাদেশে রাজনৈতিক দল নিবন্ধনের শর্তাবলি বৈশ্বিক চর্চার তুলনায় অত্যধিক কঠোর, ব্যয়বহুল এবং বৈষম্যমূলক। যে শর্ত পূরণ করতে বিপুল পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন হয় যা নতুন দলের ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক বাধা হিসেবে কাজ করে, ব্যবসায়ী ও বিভ্রাটালী গোষ্ঠীর ওপর নির্ভরশীল করে তোলে এবং রাজনীতিতে অর্থ ও পেশিজাতিক প্রভাব বৃদ্ধি করে। পাশাপাশি, আইনি সীমাবদ্ধতার কারণে নিবন্ধন প্রক্রিয়ায় সরকারের হস্তক্ষেপ এবং রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে অপব্যবহার করার সুযোগ সৃষ্টি করে। সেইসাথে, আইনি সীমাবদ্ধতা ও প্রায়োগিক চ্যালেঞ্জ দলগুলোর রাজনৈতিক অর্থায়নে অস্বচ্ছতা বৃদ্ধি করছে এবং অনানুষ্ঠানিক লেনদেনকে উৎসাহিত করছে।

রাষ্ট্রীয় আইনের পরিপালন

রাজনৈতিক দলের গঠনতন্ত্র সংরক্ষণ

বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে বিদ্যমান আইন ও বিধিবিধান পরিপালনে ঘাটতি লক্ষণীয়। আরপিও, ১৯৭২ এর ধারা ৯০খ(১)(খ) ও রাজনৈতিক দল নিবন্ধন বিধিমালা, ২০০৮ এর বিধি ৬ অনুযায়ী, নিবন্ধনে আত্মহী রাজনৈতিক দলের সুস্পষ্ট বিধানসহ দলীয় গঠনতন্ত্র থাকা বাধ্যতামূলক। গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত ৩২টি রাজনৈতিক দলই তাদের দলের গঠনতন্ত্র রয়েছে বলে দাবি করলেও এর মধ্যে চারটি দলের (সারণি ৫)সাথে একাধিকবার যোগাযোগ করা হলেও তারা গঠনতন্ত্র সরবরাহ করেনি। এসব দলগুলোর মধ্যে রয়েছে -

সারণি ৭: গঠনতন্ত্র সরবরাহ করতে না পারা দলসমূহ

ক্রম	রাজনৈতিক দলের নাম
১	আমার বাংলাদেশ পার্টি (এবি পার্টি)
২	ইসলামী এক্যুজোট
৩	বাংলাদেশ মুসলিম লীগ
৪	জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)

এছাড়াও আরপিও, ১৯৭২ এর ধারা ৯০খ(১)(ক) ও রাজনৈতিক দল নিবন্ধন বিধিমালা, ২০০৮ এর বিধি ৬ অনুযায়ী, রাজনৈতিক দল নিবন্ধনের অন্যতম প্রধান শর্ত হলো দলের একটি সক্রিয় কেন্দ্রীয় কার্যালয় থাকা। তবে মাঠ পর্যবেক্ষণে দেখা যায় যে, চারটি দল প্রাতিষ্ঠানিক কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের পরিবর্তে দলের শীর্ষ নেতাদের ব্যক্তিগত বাসভবন বা ব্যবসায়িক চেম্বারকে দলীয় কার্যালয় হিসেবে ব্যবহার করছে। এই দলগুলো হচ্ছে বাংলাদেশ মুসলিম লীগ-বিএমএল, জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক আন্দোলন-এনডিএম, বিকল্পধারা বাংলাদেশ এবং বাংলাদেশ জাস্টিস পার্টি (অনিবন্ধিত)।

রাজনৈতিক দলের গঠনতন্ত্রে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের সাথে সাংঘর্ষিক বিধানের উপস্থিতি

আরপিও, ১৯৭২ এর ধারা ৯০গ(১)-এ বলা হয়েছে-

“এই অধ্যায়ের অধীন কোনো রাজনৈতিক দল নিবন্ধীকরণের অযোগ্য হইবে, যদি- (ক) উহার গঠনতন্ত্রে বর্ণিত উদ্দেশ্যসমূহ সংবিধানের পরিপন্থী হয়; বা (খ) উহার গঠনতন্ত্রে ধর্ম, বর্ণ, গোত্র, ভাষা বা লিঙ্গ ভেদে কোনো বৈষম্য প্রতীয়মান হয়”।

অর্থাৎ আইনি বিধান অনুযায়ী নিবন্ধিত প্রতিটি রাজনৈতিক দলের গঠনতন্ত্র অবশ্যই যেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের পরিপন্থী বা ধর্ম, বর্ণ, গোত্র, ভাষা বা লিঙ্গ ভেদে বৈষম্যমূলক না হয়। কিন্তু গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত দলগুলোর মধ্যে ২৮টি দলের (যে দলগুলো গঠনতন্ত্র সরবরাহ করেছে) গঠনতন্ত্র বিশ্লেষণে দেখা যায়, ৭টি রাজনৈতিক দলের গঠনতন্ত্রে একটি সুনির্দিষ্ট ধর্মের মৌলিক বিশ্বাস ও চেতনার ভিত্তিতে রাজনৈতিক কর্মসূচি পালন, একটি সুনির্দিষ্ট ধর্মের প্রতি সকল নাগরিকের বিশ্বাস স্থাপন বা একমত পোষণ, ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থা তথা আল্লাহর খেলাফত প্রতিষ্ঠা; মুসলিম জাতীয়তাবাদ প্রতিষ্ঠা; বিদ্যমান নিয়ম-নীতিকে প্রত্যাখ্যান, প্রচলিত ‘অনৈসলামী সমাজ ব্যবস্থাকে’ ইসলাম ধর্মের আলোকে পরিবর্তন ইত্যাদি বিষয়ের উল্লেখ রয়েছে, যা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের বিভিন্ন অনুচ্ছেদ (সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ; মূলনীতিসমূহ – জাতীয়তাবাদ; ধর্ম নিরপেক্ষতা ও ধর্মীয় স্বাধীনতা; ধর্ম, প্রভৃতি কারণে বৈষম্য; ইত্যাদি)-এর সাথে সরাসরি সাংঘর্ষিক এবং ধর্ম ও লিঙ্গের ভিত্তিতে বৈষম্যমূলক।

দলগুলোর গঠনতন্ত্রে রাজনৈতিক কর্মসূচি পরিচালনা, সদস্যপদ প্রদান এবং রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মূলভিত্তি হিসেবে ইসলামের মৌলিক বিশ্বাস, খেলাফত প্রতিষ্ঠা ও ধর্মীয় আদর্শকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে, যা সংবিধানের ‘সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ’, ‘ধর্মীয় স্বাধীনতা’ ও ‘ধর্মের ভিত্তিতে বৈষম্য না করা’ নীতির সাথে সাংঘর্ষিক। সুনির্দিষ্ট দলভিত্তিক গঠনতন্ত্র পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর গঠনতন্ত্রের ভূমিকা ও ধারা ২-এ আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক না মানা এবং সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আল্লাহর বিধান ছাড়া অন্য সকল নিয়মনীতি ও পন্থাকে প্রত্যাখ্যানের কথা বলা হয়েছে, যা সংবিধানের সার্বভৌমত্বের ধারার সম্পূর্ণ বিপরীত। এছাড়া তাদের দলের গঠনতন্ত্রেও ধারা ৬, ৭ ও ১২-তে ইসলামী আকিদা পরিপন্থী প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পর্ক না রাখার কথা বলা হয়েছে, যা সংবিধানে বর্ণিত সম-অধিকার ও অসাম্প্রদায়িক চেতনার পরিপন্থী। এছাড়া গঠনতন্ত্রে মুসলিম ও অমুসলিম নাগরিকদের জন্য ‘সদস্য বা সহযোগী সদস্য’ পদ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন শর্তারোপ করা হয়েছে, যা ধর্মের ভিত্তিতে বৈষম্যের সৃষ্টি করেছে। সেইসাথে গঠনতন্ত্রে নারীদের জন্য পৃথক বিভাগের উল্লেখ করা হয়েছে, যা দলের নারী সদস্যদের সকল পদে দায়িত্ব গ্রহণের ক্ষেত্রে লিঙ্গের ভিত্তিতে বৈষম্য সৃষ্টি করেছে। একইভাবে জাতীয় পার্টির গঠনতন্ত্রে ধারা ৪-এ “ব্যাপক সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম জনগণের ধর্মীয় বিশ্বাস ও অনুভূতির প্রতি রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে অবিচল শ্রদ্ধা ও মর্যাদা প্রদর্শন” এবং “সমাজ জীবনে ইসলামী আদর্শ প্রতিষ্ঠার” কথা বলা হয়েছে যা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের মূলনীতিসমূহ, ধর্ম নিরপেক্ষতা ও ধর্মীয় স্বাধীনতা ইত্যাদির সাথে সাংঘর্ষিক। এছাড়া জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশ গঠনতন্ত্রে (ধারা ৪ ও ৭) জীবনের সর্বস্তরে ‘নেজামে মোস্তফা’ বাস্তবায়নের লক্ষ্য স্থির করা হয়েছে এবং খেলাফত মজলিস গঠনতন্ত্রে (ধারা ৩, ৪ ও ৬) ইসলামী আদর্শের ভিত্তিতে প্রতিনিধিত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠা ও সামাজিক-সাংস্কৃতিক পুনর্গঠনের মাধ্যমে আল্লাহর বিধান মান্য করার বাধ্যবাধকতা রাখা হয়েছে, যা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের মূলনীতিসমূহ; জাতীয়তাবাদ; ধর্ম নিরপেক্ষতা ইত্যাদির সাথে সাংঘর্ষিক।

অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলোর গঠনতন্ত্রে সংবিধান পরিপন্থী ধারা সুনির্দিষ্টভাবে পরিলক্ষিত হয়; যেমন বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস-এর গঠনতন্ত্রের ধারা ৩, ৪, ৫ ও ৬ -এ প্রচলিত অনৈসলামী সমাজ ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটিয়ে কুরআন-সুন্নাহ ও খেলাফতে রাশেদার আদর্শে বাংলাদেশে তথা বিশ্বজুড়ে আল্লাহর খেলাফত প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। এটি সংবিধান অনুসারে গণতান্ত্রিক ও ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র ব্যবস্থার পরিবর্তে একটি ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্রব্যবস্থা কায়েমের অঙ্গীকার ব্যক্ত করে। অপরদিকে, বাংলাদেশ মুসলিম লীগ-বিএমএল -এর গঠনতন্ত্রে (ধারা ৬) ‘মুসলিম জাতীয়তাবাদ’-এর কথা বলা হয়েছে, যা সংবিধান স্বীকৃত সার্বজনীন ও অসাম্প্রদায়িক ‘বাঙালি জাতীয়তাবাদ’-এর ব্যাখ্যার সাথে সাংঘর্ষিক। এর পাশাপাশি বাংলাদেশ লেবার পার্টিও গঠনতন্ত্রে (ধারা ৪ ও ৫) গঠনতন্ত্রে ইসলামের আদর্শ ও বিশ্বাসকে দলীয় মৌলিক ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ এবং দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম জনগণের ধর্মীয় অনুভূতি ও বিশ্বাসের প্রতি রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে অবিচল শ্রদ্ধা ও আস্থা প্রদর্শনের বাধ্যবাধকতার কথা বলা হয়েছে, যা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের মূলনীতিসমূহ, ধর্ম নিরপেক্ষতা ও ধর্মীয় স্বাধীনতা ইত্যাদির সাথে সাংঘর্ষিক। রাজনৈতিক দলগুলোর গঠনতন্ত্রে সংবিধান পরিপন্থী এসব ধারা বিদ্যমান থাকার বিষয়টি প্রমাণ করে যে, দল নিবন্ধনের ক্ষেত্রে দলের গঠনতন্ত্র যাচাই-বাছাই ও নজরদারি প্রক্রিয়া অত্যন্ত দুর্বল। নিম্নের সারণীতে দলভিত্তিক গঠনতন্ত্রের বিভিন্ন ধারা যা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের বিভিন্ন অনুচ্ছেদের সাথে সাংঘর্ষিক তা তুলে ধরা হলো-

সারণি ৮: রাজনৈতিক দলের গঠনতন্ত্রে উল্লেখিত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের সাথে সাংঘর্ষিক বিধানসমূহ

দলের নাম	সংশ্লিষ্ট দলের গঠনতন্ত্রের সংশ্লিষ্ট ধারায় উল্লেখিত বিধান	সংবিধানের সংশ্লিষ্ট অনুচ্ছেদ
১. জাতীয় পার্টি	মৌলিক আদর্শ ও মূলনীতি: “ব্যাপক সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম জনগণের ধর্মীয় বিশ্বাস ও অনুভূতির প্রতি রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে অবিচল শ্রদ্ধা ও মর্যাদা প্রদর্শন”; “সমাজ জীবনে ইসলামী আদর্শ প্রতিষ্ঠা” (ধারা ৪)	অনুচ্ছেদ ১২ ও ২৮-এর সাথে সাংঘর্ষিক
২. বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী	<p>ভূমিকা: “আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নাই”; ‘বিশ্বনবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা.) সর্বশেষ নবী ও রাসূল’; ‘আল-কুরআন ও সুন্নাহ বিশ্ব মানবতার অনুসরণীয় আদর্শ’ -ইত্যাদি মৌলিক বিশ্বাস ও চেতনার ভিত্তিতে শোষণমুক্ত ন্যায় ও ইনসাফভিত্তিক সমাজ গঠনের উদ্দেশ্যে এই গঠনতন্ত্র প্রণীত ও প্রবর্তিত”</p> <p>ঈমান ও আকীদা: “ ‘কুরআন এবং হাদীসে নির্দেশিত ঈমান ও আকীদাই জামায়াতে ইসলামীর অনুসারীগণ পোষণ করিয়া থাকেন’ -এই মৌলিক সত্য জানিয়া ও মানিয়া নিম্নলিখিত বিষয়গুলি অনিবার্যরূপে গ্রহণ করিতে হয়- “আল্লাহ ব্যতীত অপর কাহাকেও বাদশাহ, রাজাধিরাজ ও সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক মানিয়া লইবে না, কাহাকেও নিজস্বভাবে আদেশ ও নিষেধ করিবার অধিকারী মনে করিবে না, কেননা স্বীয় সমগ্র রাজ্যের নিরঙ্কুশ মালিকানা ও সৃষ্টিলোকের সার্বভৌমত্বের অধিকার আল্লাহ তা’য়ালা ব্যতীত অপর কাহারও নাই”;</p> <p>উপরোক্ত ঈমান ও আকীদা অনুযায়ী নিম্নলিখিত বিষয়গুলিও মানিয়া লওয়া আবশ্যিকঃ “স্বীয় নৈতিক চরিত্র, আচার-ব্যবহার এবং সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড, এক কথায় জীবনের সর্ববিষয়ে কেবল আল্লাহর বিধানকেই একমাত্র হিদায়াত হিসাবে মানিয়া লইবে এবং আল্লাহর দেওয়া শরীয়াতের বিপরীত যাবতীয় নিয়মনীতি ও পন্থা-পদ্ধতিকে প্রত্যাখ্যান করিবে” (ধারা ২)</p> <p>উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য: “বাংলাদেশে নিয়মতান্ত্রিক ও গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ন্যায় ও ইনসাফ ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠা এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন” (ধারা ৩)</p> <p>স্থায়ী কর্মনীতি: “সিদ্ধান্ত কিংবা কর্মপন্থা গ্রহণের সময় জামায়াত সংশ্লিষ্ট বিষয়ে শুধুমাত্র আল্লাহ ও তাঁহার রাসূল (সা.)-এর নির্দেশ ও বিধানের প্রতি গুরুত্ব প্রদান” এবং “ইসলামের দাওয়াত সম্প্রসারণ, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মানুষের মানবিক, নৈতিক চরিত্রের সংশোধন” এর লক্ষ্যে জনমত গঠন (ধারা ৪)</p> <p>স্থায়ী কর্মসূচি: “সকল নাগরিকের নিকট ইসলামের প্রকৃত রূপ বিশ্লেষণ করিয়া চিন্তার বিশুদ্ধিকরণ ও বিকাশ সাধনের মাধ্যমে জীবনের সর্বক্ষেত্রে ইসলামের অনুসরণ ও ইসলাম প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে অনুভূতি জাগ্রত করা”; “ইসলামকে জীবনের সর্বক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত করিবার সংগ্রামে আগ্রহী সৎ ব্যক্তিদিগকে সংগঠিত করা”; “ইসলামী মূল্যবোধের ভিত্তিতে সামাজিক সংশোধন, নৈতিক পুনর্গঠন ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তন সাধন”; এবং “নিয়মতান্ত্রিক ও গণতান্ত্রিক পন্থায় সরকার পরিবর্তন এবং সমাজের সর্বস্তরে আল্লাহভীরু, চরিত্রবান, সৎ ও যোগ্য লোকের নেতৃত্ব কায়েমের চেষ্টা করা” (ধারা ৬)</p> <p>সদস্য (রকন) হওয়ার শর্ত: “ব্যক্তিগত জীবনে ফরজ ও ওয়াজিবসমূহ আদায় করেন এবং কবীরা গুনাহ হইতে বিরত থাকেন”; “উপার্জনের এমন কোন পন্থা অবলম্বন না করেন যাহা আল্লাহর নাফরমানির পর্যায়ে পড়ে”; “এমন কোন প্রতিষ্ঠানের সহিত সম্পর্ক না রাখেন যাহার মূলনীতি, উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ইসলামের ঈমান ও আকীদা এবং বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য এবং কর্মনীতির পরিপন্থী”। (ধারা ৭)</p> <p>সহযোগী সদস্য হওয়ার শর্ত: “বাংলাদেশের যে কোন নাগরিক বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য এবং কর্মসূচির সহিত ঐক্যমত্য পোষণ করিলে সহযোগী সদস্য হইতে পারিবেন” (ধারা ১১)</p> <p>অমুসলিম নাগরিকের সদস্য হওয়ার শর্ত: “রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কর্মসূচির সহিত একমত্য পোষণ করিলে বাংলাদেশের যে কোন অমুসলিম নাগরিক ইহার সহযোগী সদস্য/সদস্য হইতে পারিবেন”(ধারা ১২)</p>	অনুচ্ছেদ ৭, ৮, ৯, ১২ ও ২৮-এর সাথে সাংঘর্ষিক

দলের নাম	সংশ্লিষ্ট দলের গঠনতন্ত্রের সংশ্লিষ্ট ধারায় উল্লেখিত বিধান	সংবিধানের সংশ্লিষ্ট অনুচ্ছেদ
৩. জমিয়তে ইলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশ	<p>উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য: “মানব জীবনের উদ্দেশ্য হচ্ছে- জীবনের সর্বক্ষেত্রে বিশ্ব মানবতার মুক্তির দূত রাসূলুল্লাহ (সা.) এর আদর্শ অনুসরণের মাধ্যমে একমাত্র আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের রেয়া ও সন্তুষ্টি অর্জন” সে উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে জমিয়তের লক্ষ্য হচ্ছে- “ব্যক্তিগত, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে তথা জীবনের সর্বস্তরে আল্লাহর নেজাম বাস্তবায়নের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া”; এবং “জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সর্বস্তরের জনগণের দৈনন্দিন জীবনের সকল সমস্যার সৃষ্ঠু সমাধানের জন্য নেজামে মোস্তফার বাস্তবায়ন” (ধারা ৪)</p> <p>সদস্য: “আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাত -এর আকীদায় বিশ্বাসী যে কোনো মুসলমান এই প্রতিষ্ঠানের সদস্য হতে পারবে”; “ইসলামী জীবন ব্যবস্থার প্রতি শ্রদ্ধাশীল যে কোনো অমসলিমও জমিয়তের সদস্য হতে পারবে”; “জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশ এর লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও আদর্শের সাথে একমত হয়ে নির্ধারিত ফরমে দস্তখতকরতঃ ২০/- (বিশ) টাকা ফি প্রদান করে এর সদস্য হতে হবে” (ধারা ৭)</p>	অনুচ্ছেদ ৮, ৯, ১২ ও ২৮ এর সাথে সাংঘর্ষিক
৪. বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস	<p>আদর্শ ও উদ্দেশ্য : “আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে দুনিয়া ও আখেরাতের মুক্তি ও প্রকৃত কল্যাণ লাভের উপায় হিসেবে বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস প্রচলিত অনৈসলামী সমাজ ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন সাধন করে কুরআন সুন্নাহর ভিত্তিতে এবং খেলাফতে রাশেদার দৃষ্টান্তের অনুসরণে প্রথমে বাংলাদেশে একটি ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থা তথা আল্লাহর খেলাফত প্রতিষ্ঠা এবং চূড়ান্ত পর্যায়ে সমগ্র দুনিয়ায় আল্লাহর খেলাফত প্রতিষ্ঠার পথ প্রশস্ত করতে চায়” (ধারা ৩)।</p> <p>মৌল কর্মনীতি : “সকল বিষয়ে কুরআন-সুন্নাহ, খেলাফতে রাশেদার দৃষ্টান্ত অনুসরণ এবং আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামায়াতের আকীদায় পরিপূর্ণ বিশ্বাসী হওয়া” (ধারা ৪)।</p> <p>মৌল কর্মসূচী: “পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা হিসেবে দ্বীনের ব্যাপক প্রচার-প্রসার ও খেলাফত প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব তুলে ধরা এবং জীবনের সর্বস্তরে দ্বীন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে জনগণকে সচেতন ও উদ্বুদ্ধ করা”; “খেলাফত প্রতিষ্ঠায় আগ্রহী সর্বস্তরের জনগণকে বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের আওতায় সংঘবদ্ধ করা”; “কুরআন ও সুন্নাহর ভিত্তিতে সমাজ কাঠামোর পরিবর্তন এর লক্ষ্যে ব্যাপক জনমত তৈরি ও গণআন্দোলন গড়ে তোলা” (ধারা ৫)</p> <p>সাংগঠনিক স্তর: “যে কোনো ব্যক্তি বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের আদর্শ, উদ্দেশ্য ও কর্মসূচীর সাথে একমত হয়ে সংগঠনের নির্ধারিত ফরম পূরণ করে যোগদান করলে তিনি সদস্যভুক্ত হবেন”; “যে সদস্য সংগঠনের নিয়মিত দাওয়াতী কাজ, সংগঠনের ঘোষিত কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ, এয়ানত প্রদান এবং শৃংখলা মেনে চলবে, তিনি কর্মী হওয়ার উপযুক্ত হবেন”; “যে কর্মী নিম্নলিখিত শর্তাবলী পূরণ করবেন, তিনি খেলাফত মজলিসের নকীব হওয়ার যোগ্য হবেন- “খেলাফত মজলিসের আদর্শ, উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের সাথে একাত্মতা ঘোষণা এবং নীতি-পলিসি ও কর্মসূচির সাথে ঐকমত্য পোষণ”, “ইসলামের মৌলিক বিধি-বিধান মেনে চলা”, “দ্বীন ইসলাম ও খেলাফত প্রতিষ্ঠার আন্দোলন সম্পর্কে প্রয়োজনীয় জ্ঞান অর্জন” (ধারা ৬)</p>	অনুচ্ছেদ ১, ৮, ৯, ১২ ও ২৮ এর সাথে সাংঘর্ষিক
৫. খেলাফত মজলিস	<p>লক্ষ্য: “বাংলাদেশে ইসলামী আদর্শের আলোকে ন্যায় ও ইনসাফভিত্তিক জনকল্যাণমূলক, জনপ্রতিনিধিত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠা” (ধারা ৩)</p> <p>মৌল কর্মসূচী: “ইসলামী জীবনব্যবস্থার ব্যাপক প্রচার-প্রসার ও খেলাফত রাষ্ট্রব্যবস্থার গুরুত্ব তুলে ধরা এবং জীবনের সর্বস্তরে দ্বীন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে জনগণকে সচেতন ও উদ্বুদ্ধ করা”; “ইসলামী আদর্শের ভিত্তিতে সমাজ কাঠামোর পুনর্গঠন এর লক্ষ্যে ব্যাপক জনমত তৈরী ও গণআন্দোলন গড়ে তোলা” (ধারা ৪)</p> <p>সদস্যপদ: “যে কোনো ব্যক্তি খেলাফত মজলিসের আদর্শ, উদ্দেশ্য ও কর্মসূচির সাথে একমত হয়ে সংগঠনে যোগদান করলে তিনি প্রাথমিক সদস্যভুক্ত হবেন”;</p> <p>সংগঠনের যে কর্মী নিম্নলিখিত শর্তাবলী পূরণ করবেন তিনি খেলাফত মজলিসের সদস্য হতে পারবেন:</p> <p>খেলাফত মজলিসের মূলনীতি, আদর্শ, উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের প্রতি একাত্মতা ঘোষণা এবং নীতি-পলিসি ও কর্মসূচির সাথে ঐকমত্য পোষণ; ইসলামের মৌলিক বিধিবিধান মেনে চলা” (ধারা ৬)</p>	অনুচ্ছেদ ৮, ৯, ১২ ও ২৮ এর সাথে সাংঘর্ষিক

দলের নাম	সংশ্লিষ্ট দলের গঠনতন্ত্রের সংশ্লিষ্ট ধারায় উল্লেখিত বিধান	সংবিধানের সংশ্লিষ্ট অনুচ্ছেদ
৬. বাংলাদেশ মুসলিম লীগ-বিএমএল	লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য: “মুসলিম জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে বিশ্বের সকল মুসলমানের মধ্যে পারস্পরিক স্বার্থ ও অস্তিত্ব রক্ষার প্রয়োজনে একটি আত্মিক সম্পর্ক ও ঐক্য গড়ে তোলা”; “মুসলিম জাতীয়তাবাদ এবং ইসলামের শ্বাশত বাণী ইনসাফের আলোকে জাতি, ধর্ম, বর্ণ, গোষ্ঠী নির্বিশেষে সকল নাগরিকের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করতঃ বাংলাদেশকে একটি জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্র হিসাবে গড়ে তোলা” (ধারা ৬)	অনুচ্ছেদ ৮, ৯, ও ১২ এর সাথে সাংঘর্ষিক
৭. বাংলাদেশ লেবার পার্টি	মৌলিক আদর্শ: “ইসলামী আদর্শ ও বিশ্বাস” (ধারা ৪) মূলনীতি: “সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম জনগণের ধর্মীয় বিশ্বাস ও অনুভূতির প্রতি রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে অবিচল আস্থা, শ্রদ্ধা ও মর্যাদা প্রদর্শন”; “সমাজ জীবনে ইসলামী আদর্শ প্রতিষ্ঠা” (ধারা-৫)	অনুচ্ছেদ ১২ ও ২৮ এর সাথে সাংঘর্ষিক

তথ্যের উৎস: সংশ্লিষ্ট দলের গঠনতন্ত্র পর্যালোচনা

রাজনৈতিক দলের সহযোগী বা অঙ্গ সংগঠন এবং বিদেশে সংগঠন বা শাখা পরিচালনা

আরপিও, ১৯৭২ এর ধারা ৯০খ(১)(খ)(ই)-এ বলা হয়েছে

“নিবন্ধনে আত্মহী রাজনৈতিক দলের দলীয় গঠনতন্ত্রে নিম্নরূপ সুস্পষ্ট বিধান থাকিতে হইবে, যথা: (ই) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক বা ছাত্র এবং আর্থিক, বাণিজ্যিক বা শিল্প প্রতিষ্ঠানের বা সংস্থার কর্মচারী বা শ্রমিকদের বা অন্য কোনো পেশার সদস্যগণের সমন্বয়ে গঠিত সহযোগী বা অঙ্গ সংগঠন না থাকা”।

অর্থাৎ নিবন্ধিত কোনো রাজনৈতিক দল তাদের গঠনতন্ত্রে শিক্ষক, ছাত্র, শ্রমিক কিংবা আর্থিক, বাণিজ্যিক ও শিল্প প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা-কর্মচারীসহ যেকোনো পেশার সদস্যদের নিয়ে গঠিত সহযোগী বা অঙ্গ সংগঠন রাখতে পারবে না। তবে বাস্তবে অধিকাংশ রাজনৈতিক দলের গঠনতন্ত্রে এবিষয়ে স্পষ্টভাবে উল্লেখ না করলেও প্রায় সকল নিবন্ধিত দল, বিশেষ করে বৃহৎ ও প্রভাবশালী রাজনৈতিক দলগুলো, ‘সহযোগী’ বা ‘ভ্রাতৃপ্রতিম’ সংগঠনের নামে ছাত্র, শিক্ষক ও বিভিন্ন পেশাজীবীদের নিয়ে পৃথক সংগঠন সরাসরি পরিচালনা করে থাকে। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, ‘সহযোগী’ বা ‘ভ্রাতৃপ্রতিম’ ছাত্র সংগঠনের যোগাযোগের ঠিকানা হিসেবে দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের ঠিকানা ব্যবহার করা হচ্ছে। আইনি বাধ্যবাধকতাকে এড়িয়ে এভাবে সহযোগী বা অঙ্গ সংগঠন পরিচালনা করা আইনি বিধানের মূল উদ্দেশ্যকে ব্যাহত করে এবং শিক্ষাঙ্গনসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে প্রত্যক্ষ দলীয় রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তারের সুযোগ সৃষ্টি করছে।

সেইসাথে আরপিও, ১৯৭২ এর ধারা ৯০গ(১)(ঙ)-এ বলা হয়েছে-

“এই অধ্যায়ের অধীন কোনো রাজনৈতিক দল নিবন্ধীকরণের অযোগ্য হইবে, যদি-(ঙ) উহার গঠনতন্ত্রে দেশের ভৌগোলিক সীমার বাহিরে কোনো অফিস, শাখা বা কমিটি গঠন এবং পরিচালনার বিধান থাকে”।

আইনের এই ধারা অনুযায়ী বাংলাদেশের ভৌগোলিক সীমার বাইরে রাজনৈতিক দলের কোনো কার্যালয়, শাখা বা কমিটি গঠন ও পরিচালনা সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কিন্তু গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত দেশের অন্যতম বৃহৎ দুইটি রাজনৈতিক দলের (বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল-বি.এন.পি এবং বর্তমানে কার্যক্রম নিষিদ্ধ ঘোষিত বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ) গঠনতন্ত্রে বিদেশের মাটিতে দলীয় লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, আদর্শ ও নীতি মেনে সংগঠন ও দলীয় কার্যক্রম পরিচালনার বিষয়ে সুস্পষ্ট বিধান রয়েছে। এছাড়াও গঠনতন্ত্রে সরাসরি উল্লেখ না থাকলেও গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত অন্তত ৬টি রাজনৈতিক দলের (জাতীয় পার্টি, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী, জাকের পার্টি, ইসলামী ঐক্যজোট, বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস, জাতীয় নাগরিক পার্টি) বাংলাদেশের ভৌগোলিক সীমার বাইরে দলীয় শাখা ও সাংগঠনিক কার্যক্রম সক্রিয়ভাবে পরিচালনার দৃষ্টান্ত লক্ষ করা গেছে। দেশের ভৌগোলিক সীমানার বাইরে রাজনৈতিক শাখা গঠন ও দলীয় কর্মকাণ্ড পরিচালনা করার এই প্রবণতা রাজনৈতিক দলগুলোর আইন লঙ্ঘনের ঘটনা এবং এক্ষেত্রে দলগুলোকে জবাবদিহির আওতায় নিয়ে আসার ক্ষেত্রে ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়।

অভ্যন্তরীণ গণতন্ত্র চর্চা

দলীয় প্রধান নির্বাচন প্রক্রিয়া: গঠনতন্ত্র অনুসরণ ও বাস্তব চর্চা

রাজনৈতিক দলের নেতৃত্ব নির্বাচন একটি গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক ব্যবস্থার গুণগতমান নির্ধারণের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। আধুনিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় রাজনৈতিক দলগুলোর মাধ্যমেই অংশগ্রহণ, প্রতিযোগিতা, জবাবদিহি এবং নেতৃত্ব বিকাশের চর্চা হয়ে থাকে তাই রাজনৈতিক দলগুলোকে “গণতন্ত্রের বিদ্যালয়” (schools of democracy) হিসেবে বিবেচনা করা হয় (স্কারো, ২০০৫)। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সামগ্রিক স্থিতিশীলতা ও স্থায়িত্ব অনেকাংশে রাজনৈতিক দলগুলোর অভ্যন্তরীণ কাঠামো ও গণতান্ত্রিক চর্চার গুণগত মানের ওপর নির্ভরশীল। রাজনৈতিক দলের অভ্যন্তরীণ গণতান্ত্রিক চর্চা মূল গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে নেতৃত্ব নির্বাচনের প্রক্রিয়া, যা একটি দলের প্রতিনিধিত্বমূলক চরিত্র, জবাবদিহি এবং সাংগঠনিক প্রাণশক্তি নির্ধারণে মুখ্য ভূমিকা পালন করে। প্রকৃত অর্থে একটি প্রতিনিধিত্বমূলক রাজনৈতিক সংগঠন গড়ে তুলতে হলে নেতৃত্ব নির্বাচন করার ক্ষেত্রে অন্তর্ভুক্তিমূলক ও প্রতিযোগিতামূলক নির্বাচন

প্রক্রিয়ার উপস্থিতি অপরিহার্য (ক্রস ও কাংজ, ২০১৩)। অন্তর্ভুক্তিমূলক নির্বাচন প্রক্রিয়া সাধারণ সদস্যদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে এবং দলীয় নেতৃত্বকে তৃণমূলের সঙ্গে সংযুক্ত রাখে।

বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলোর ক্ষেত্রে দলীয় গঠনতন্ত্রে বর্ণিত নেতৃত্ব নির্বাচন সংক্রান্ত বিধান এবং বাস্তব চর্চার প্রকৃতি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, নির্বাচন পদ্ধতির ক্ষেত্রে প্রায় সকল দলের গঠনতন্ত্রে কেন্দ্রীয় বা জাতীয় কাউন্সিলে ভোটের মাধ্যমে দলীয় প্রধান নির্বাচনের বিধান বিদ্যমান। তবে, বাস্তবে এই নির্বাচন অধিকাংশ সময় গোপন ব্যালটের পরিবর্তে কণ্ঠভোট, হাত তুলে ভোট বা আলোচনার ভিত্তিতে সম্পন্ন হয়। এর ফলে ভোটদান প্রক্রিয়া স্বাধীন ও গোপন থাকার পরিবর্তে দৃশ্যমান ও নিয়ন্ত্রিত হয়ে পড়ে, যা সদস্যদের স্বতন্ত্র মতপ্রকাশকে নিরুৎসাহিত করে। এই বাস্তবতা দলীয় প্রধান নির্বাচনী প্রক্রিয়াকে অভ্যন্তরীণ গণতান্ত্রিক প্রতিযোগিতার পরিবর্তে অনুমোদনমূলক আনুষ্ঠানিকতায় রূপান্তরিত করে। গোপন ভোটের মাধ্যমে নির্বাচন পদ্ধতির অনুপস্থিতির ফলে দলের ভেতর এক ব্যক্তির নিরঙ্কুশ কর্তৃত্বের চর্চা লক্ষণীয় যা দলের মধ্যে ভিন্নমত প্রকাশের সুযোগ হ্রাস করে।

সারণি ৯: দলীয় প্রধান নির্বাচন গঠনতন্ত্র ও বাস্তব চর্চার অসঙ্গতি

বিষয়	দলীয় গঠনতন্ত্রের বিধান	চর্চা ও অসঙ্গতি
দলীয় প্রধান নির্বাচন, প্রার্থী মনোনয়ন ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা	সকল দলের গঠনতন্ত্রে কেন্দ্রীয়/জাতীয় কাউন্সিলে ভোটের মাধ্যমে দলীয় প্রধান নির্বাচিত করার বিধান বিদ্যমান	<ul style="list-style-type: none"> অধিকাংশ দল জাতীয় কাউন্সিলের মাধ্যমে দলের প্রধান নির্বাচিত করলেও গোপন ব্যালট ভোটের পরিবর্তে কণ্ঠ ভোটের মাধ্যমে নির্বাচন অধিকাংশ রাজনৈতিক দলে দলীয় প্রধান পদের নির্বাচনে একাধিক ব্যক্তির মনোনয়ন গ্রহণের চর্চা নেই; মাত্র দুইটি দলে (সিপিবি এবং এবি পার্টি) একাধিক প্রতিদ্বন্দ্বী লক্ষ করা যায়

অন্যদিকে, মনোনয়ন ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার ক্ষেত্রে গঠনতান্ত্রিক ও বাস্তব চর্চার ব্যবধান আরও প্রকট। রাজনৈতিক দলগুলোতে বিশেষত বড় রাজনৈতিক দলগুলোতে, একজনের বেশি প্রার্থীর মনোনয়নের নজির প্রায় অনুপস্থিত। গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণে দেখা গেছে যে, গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত দলগুলোর মধ্যে বাংলাদেশের কমউনিস্ট পার্টি (সিপিবি) এবং আমার বাংলাদেশ পার্টির (এবি পার্টি) দলীয় প্রধান নির্বাচনে একাধিক প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছে।

গবেষণায় রাজনৈতিক দলগুলোর গঠনতন্ত্র ও সাংগঠনিক বিধান বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, নেতৃত্ব নির্বাচন ও নেতৃত্বের ধারাবাহিকতা নির্ধারণের ক্ষেত্রে অভ্যন্তরীণ গণতান্ত্রিক কাঠামো দুর্বল। অধিকাংশ দলের গঠনতন্ত্রেই একজন ব্যক্তি কতবার বা কত মেয়াদে দলীয় প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে পারবেন, সে বিষয়ে স্পষ্ট সীমা নির্ধারণ করা হয়নি। এর ফলে দীর্ঘ সময় ধরে একই ব্যক্তির নেতৃত্বে দল পরিচালিত হওয়ার সুযোগ রয়েছে। নিয়মিত নেতৃত্ব পরিবর্তনের চর্চার অনুপস্থিতি দলীয় জবাবদিহি ও ক্ষমতার চক্রাকার পরিবর্তন (leadership rotation) বাধাগ্রস্ত করে এবং ক্ষমতা কেন্দ্রীয়করণের প্রবণতাকে আরও শক্তিশালী করে। একই সঙ্গে, বেশ কয়েকটি দলে প্রধান নেতৃত্বের ধারাবাহিকতা পারিবারিক উত্তরাধিকারের ভিত্তিতে নির্ধারিত হয়েছে। পারিবারিক বিবেচনায় নেতৃত্ব নির্বাচনের কারণে দলীয় প্রধান নির্বাচনে প্রতিযোগিতা, উন্মুক্ততা এবং যোগ্যতাভিত্তিক অগ্রগতির সুযোগ সংকুচিত হয় এবং দলীয় কাঠামো ব্যক্তিনির্ভর হয়ে ওঠার সুযোগ সৃষ্টি হয়।

নেতৃত্ব নির্বাচনের যোগ্যতার ক্ষেত্রেও উল্লেখযোগ্য সীমাবদ্ধতা পরিলক্ষিত হয়। অধিকাংশ দলের গঠনতন্ত্রে শীর্ষ নেতৃত্বের পদে নির্বাচিত হওয়ার জন্য ন্যূনতম সাংগঠনিক অভিজ্ঞতা, দলীয় কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ততা বা নেতৃত্বের পূর্ব অভিজ্ঞতার কোনো সুস্পষ্ট শর্ত উল্লেখ নেই। ফলে নেতৃত্ব নির্বাচনের ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা, সাংগঠনিক দক্ষতা, সাংগঠনিক অবদানের পরিবর্তে পারিবারিক পরিচয়, আর্থিক সামর্থ্য, সামাজিক প্রভাব বা ব্যক্তিগত তারকাখ্যাতির মতো বিষয়গুলোকে প্রাধান্য দেওয়ার বিষয়টি লক্ষ করা যায়।

রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে অন্তত ৩টি দলের (বাংলাদেশ মাইনরিটি জনতা পার্টি, বাংলাদেশ লেবার পার্টি, জাতীয় পার্টি) দলীয় প্রধানকে কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক কাঠামো গঠন বা গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ প্রদানের প্রত্যক্ষ ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে। তবে দলীয় প্রধানের সাংগঠনিক আওতা বিশেষ করে কমিটি পুনর্গঠন, শূন্যপদ পূরণ, সাংগঠনিক মনোনয়ন এবং দলীয় কাঠামো পরিচালনার ক্ষেত্রে প্রায় সকল দলেরই দলীয় প্রধানের হাতে প্রস্রাভীত ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে। ফলস্বরূপ, আনুষ্ঠানিকভাবে কাউন্সিল বা প্রতিনিধিভিত্তিক নির্বাচন ব্যবস্থা বিদ্যমান থাকলেও সাংগঠনিক ক্ষমতার উল্লেখযোগ্য অংশ দলীয় প্রধানের হাতে কেন্দ্রীভূত থাকে।

সামগ্রিকভাবে, এসব বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করে যে, রাজনৈতিক দলগুলোর নেতৃত্ব নির্বাচন নিশ্চিত করার প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ ঘাটতি বিদ্যমান রয়েছে। ফলে নেতৃত্বের নবায়ন, অভিজ্ঞতাভিত্তিক নেতৃত্ব বিকাশ এবং সদস্যভিত্তিক গণতান্ত্রিক অংশগ্রহণের পরিবর্তে ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা ও নেতৃত্বের কেন্দ্রীয়ভবনের প্রবণতা শক্তিশালী হওয়ার সুযোগ রয়েছে। বাংলাদেশের অধিকাংশ রাজনৈতিক দলে দলীয় নেতৃত্ব নির্বাচন প্রকৃত অর্থে একটি গণতান্ত্রিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার পরিবর্তে ক্ষমতা সংরক্ষণ ও বৈধতা উৎপাদনের একটি প্রাতিষ্ঠানিক কৌশলে পরিণত হয়েছে।

রাজনৈতিক দলে পরিবার-কেন্দ্রিক নেতৃত্ব নির্বাচনের চর্চা

বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলোর প্রধান নেতৃত্ব নির্বাচন প্রক্রিয়া গঠনতাত্ত্বিক নিয়ম ও বাস্তব অনুসরণের ব্যত্যয়ের মাধ্যমে পরিচালিত হয়ে থাকে। রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে প্রধান নেতৃত্ব নির্বাচন প্রক্রিয়া গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে পরিচালিত না হবার মূলে রয়েছে পরিবারভিত্তিক নেতৃত্ব নির্বাচন বা দলের ওপর একক ব্যক্তির প্রভাব ও আধিপত্য। সুশাসনের দৃষ্টিকোণ থেকে রাজনৈতিক দলগুলোর নেতৃত্ব নির্বাচন করা অভ্যন্তরীণ গণতান্ত্রিক রাজনীতির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ।

বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলোতে প্রধান নেতৃত্ব নির্বাচনের ক্ষেত্রে যে অভ্যন্তরীণ গণতান্ত্রিক চর্চার অনুপস্থিতি রয়েছে তার প্রকাশ ঘটেছে গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে দশটি রাজনৈতিক দলে নেতৃত্ব পারিবারিক বিবেচনায় একই পরিবারের ভেতর স্থানান্তরিত হয়েছে, যেমন-পিতা/মাতা থেকে সন্তান, ভাই থেকে ভাই ও স্বামী থেকে স্ত্রীর হাতে। নেতৃত্ব নির্বাচনের ক্ষেত্রে পরিবার-কেন্দ্রিকতার সবচেয়ে প্রচলিত রূপ দেখা যায় পিতা/মাতা-সন্তান সম্পর্কের মাধ্যমে ক্ষমতা হস্তান্তরে। পারিবারিক বিবেচনায় নেতৃত্বের পরিবর্তন কোনো উন্মুক্ত প্রতিযোগিতা বা সদস্যভিত্তিক নির্বাচনের মাধ্যমে সংঘটিত হয়নি। রাজনৈতিক দলগুলোতে নেতৃত্বের ধারাবাহিকতা রক্ষা করার চর্চা দেখানো হলেও বাস্তবে দলীয় প্রতিযোগিতা ও বিকল্প নেতৃত্ব বিকাশের পথ সংকুচিত হয়েছে।

সারণি ১০: রাজনৈতিক দলসমূহে পারিবারিক বিবেচনায় নেতৃত্ব নির্বাচন ও হস্তান্তর

রাজনৈতিক দলের নাম	
<ul style="list-style-type: none"> বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ (বর্তমানে কার্যক্রম নিষিদ্ধ) বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল - বি.এন.পি জাতীয় পার্টি জাকের পার্টি বাংলাদেশ মুসলিম লীগ 	<ul style="list-style-type: none"> ন্যাশনাল পিপলস পার্টি (এনপিপি) বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি-বাংলাদেশ ন্যাপ বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস জাতীয় গণতান্ত্রিক পার্টি-জাগপা বাংলাদেশ জাস্টিস পার্টি

বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলোর নেতৃত্ব নির্বাচন প্রক্রিয়া বোঝার ক্ষেত্রে কেবল পারিবারিক উত্তরাধিকারকে বিশ্লেষণের কেন্দ্রে রাখলে পূর্ণ চিত্র পাওয়া যায় না। এর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত রয়েছে আনুগত্যভিত্তিক রাজনৈতিক সম্পর্ক বা মুরব্বি-মক্কেল (patron-client) ব্যবস্থা। বাস্তবে এই দুই প্রক্রিয়া, পারিবারিক উত্তরাধিকার এবং মুরব্বি-মক্কেলভিত্তিক রাজনৈতিক নেটওয়ার্ক, একসঙ্গে কাজ করে একই ব্যক্তির বারবার নেতৃত্বে নির্বাচিত হওয়ার পথ সুগম করে এবং নতুন বা দ্বিতীয় সারির নেতৃত্বের বিকাশকে সীমিত করে।

পারিবারিক রাজনীতিতে নেতৃত্ব সাধারণত একই পরিবারের সদস্যদের মধ্যে আবর্তিত হয়। অন্যদিকে, মুরব্বি-মক্কেল সম্পর্কের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা রাজনৈতিক কাঠামোতে ক্ষমতা পুনরুৎপাদিত হয় পারস্পরিক নির্ভরতার মাধ্যমে। এখানে দলের শীর্ষ নেতা বা দলীয় প্রধান মুরব্বির (patron) ভূমিকায় অবতীর্ণ হন মনোনয়ন, পদ, সম্পদ এবং রাজনৈতিক সুরক্ষা প্রদান করার মাধ্যমে। বিপরীতে, তৃণমূল বা মধ্যম স্তরের নেতারা মক্কেল (client) হিসেবে দলীয় প্রধানের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করেন। এই সম্পর্ক আদর্শগত অবস্থান, নীতিগত যোগ্যতা বা সাংগঠনিক দক্ষতার ওপর প্রতিষ্ঠিত নয়; বরং ব্যক্তিগত সম্পর্ক, সুবিধাপ্রাপ্তি বা প্রদান এবং ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক নিরাপত্তার ওপর নির্ভরশীল। এই আনুগত্যনির্ভর সংস্কৃতি একই ব্যক্তির বারবার নেতৃত্বে নির্বাচিত হওয়ার অন্যতম প্রধান কারণ। দলীয় নির্বাচনে ভোট বা সমর্থন অনেক ক্ষেত্রে স্বাধীন রাজনৈতিক বিবেচনার ভিত্তিতে নয়, বরং পৃষ্ঠপোষকের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হয়। ফলে নির্বাচন প্রকৃত অর্থে প্রতিযোগিতামূলক সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়া না হয়ে বিদ্যমান ক্ষমতার পুনরায় বৈধতা প্রদানের একটি আনুষ্ঠানিক প্রক্রিয়া হিসেবে চর্চিত হয়। যিনি বারবার নির্বাচিত হন, তিনি নির্বাচন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে ক্ষমতায় এলেও বাস্তবে তাঁর নির্বাচনের ফল আগেই আনুগত্যের নেটওয়ার্ক দ্বারা অনেকাংশে নির্ধারিত থাকে।

সার্বিকভাবে বলা যায়, বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলোতে নেতৃত্বের ধারাবাহিকতা কেবল পারিবারিক উত্তরাধিকার দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায় না; বরং এটি পারিবারিক রাজনীতি এবং মুরব্বি-মক্কেল (patron-client) সম্পর্কের পারস্পরিক ক্রিয়ার মাধ্যমে টিকে থাকে ও পুনরুৎপাদিত হয়। পারিবারিক উত্তরাধিকার যেখানে শীর্ষ পর্যায়ের নেতৃত্বকে বৈধতা ও ধারাবাহিকতা প্রদান করে, সেখানে মুরব্বি-মক্কেলভিত্তিক রাজনৈতিক নেটওয়ার্ক আনুগত্য, সম্পদ বণ্টন এবং রাজনৈতিক নির্ভরতার মাধ্যমে সেই নেতৃত্বকে সংগঠনজুড়ে সুসংহত করে। এই দুই প্রক্রিয়ার সমন্বয়ে রাজনৈতিক ক্ষমতা একটি সীমিত গোষ্ঠীর হাতে কেন্দ্রীভূত হবার মাধ্যমে নেতৃত্ব নির্বাচনে প্রতিযোগিতামূলক ও অংশগ্রহণমূলক চর্চার সুযোগ সংকুচিত হয়েছে।

বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রধানের নেতৃত্ব প্রদানের সময়কাল

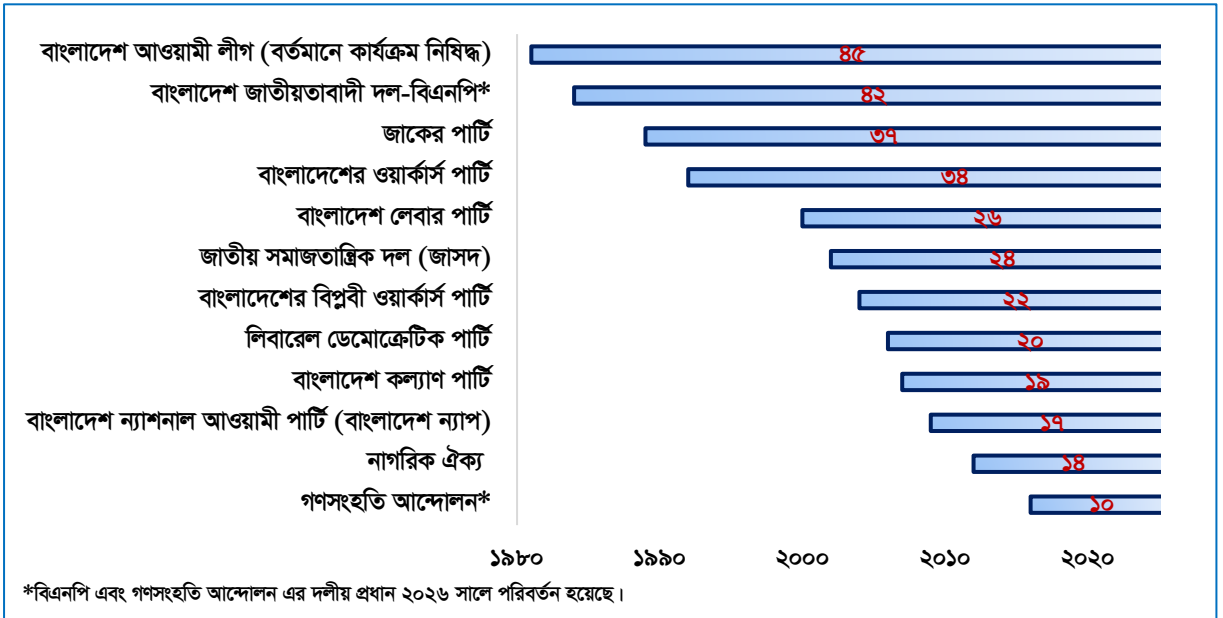
রাজনৈতিক দলের অভ্যন্তরীণ গণতান্ত্রিক চর্চার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো নির্দিষ্ট মেয়াদে দলীয় নেতৃত্ব পরিবর্তন, যা মূলত অভ্যন্তরীণ জবাবদিহি, প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ এবং গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া ও চর্চার স্থায়ীত্বের ওপর প্রভাব রাখে। বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলোর ক্ষেত্রে পরিবারভিত্তিক নেতৃত্ব গ্রহণের প্রবণতার পাশাপাশি দীর্ঘ সময় ধরে একই ব্যক্তির দলীয় নেতৃত্ব প্রদান বা নেতৃত্ব ধরে রাখার প্রবণতা বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

সারণি ১১: রাজনৈতিক দলগুলোর দলীয় প্রধানের নেতৃত্ব প্রদানের মেয়াদ বা সময়কাল

দলীয় প্রধানের মেয়াদ (বছর)	রাজনৈতিক দলের সংখ্যা
< ১০ বছর	২০টি
১০ - ২০ বছর	৫টি
> ২০ বছর	৭টি
মোট দল	৩২টি

গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত রাজনৈতিক দলগুলোর নেতৃত্ব-সংক্রান্ত তথ্য বিশ্লেষণ করলে স্পষ্ট হয় যে, বাংলাদেশে রাজনৈতিক দলগুলোর নেতৃত্বের দীর্ঘ মেয়াদ লক্ষণীয়। দলগুলোর দলীয় প্রধানের নেতৃত্বের মেয়াদ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, কমপক্ষে বারটি রাজনৈতিক দলের প্রধান এক দশক বা তার বেশি সময় ধরে দলীয় প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। পাশাপাশি, সাতটি রাজনৈতিক দলে একই ব্যক্তি টানা দুই দশক ধরে দলীয় প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। বাংলাদেশের দুটি বৃহৎ প্রধান রাজনৈতিক দল বিএনপি ও আওয়ামী লীগের দলীয় প্রধানের যথাক্রমে ৪১ ও ৪৫ বছর ধরে নেতৃত্ব প্রদান। তবে সাম্প্রতিক সময়ে বিএনপির দলীয় প্রধান পরিবর্তন হয়েছে। এই চর্চা সাংগঠনিক স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করলেও সময়ের পরিক্রমায় মূলত অতিমাত্রায় নেতৃত্ব কেন্দ্রীভূত হয়, বিকল্প নেতৃত্ব বিকাশের সম্ভাবনা সংকুচিত হয় এবং অভ্যন্তরীণ গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে দুর্বল করে। ফলে দলীয় প্রতিষ্ঠান ব্যক্তি নির্ভর হয়ে ওঠে এবং নেতৃত্বের ধারাবাহিকতা ক্রমশ প্রাতিষ্ঠানিক প্রতিযোগিতার পরিবর্তে ক্ষমতার পুনরুৎপাদনের মাধ্যমে বজায় থাকে।

চিত্র ২: রাজনৈতিক দলের প্রধানদের নেতৃত্বের সময়কাল (১০ বছরের অধিক)



বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলোতে দল সংগঠন হিসেবে টিকে থাকা ও কার্যকারিতাকে একজন মাত্র নেতার ধারাবাহিক নেতৃত্বের ওপর নির্ভরশীল করে তুলেছে। ফলে রাজনৈতিক দল একটি প্রাতিষ্ঠানিক সংগঠন না হয়ে কার্যত এক ব্যক্তিনির্ভর কর্তৃত্ব কাঠামোতে পরিণত হয়েছে। দলীয় প্রধানের দীর্ঘ সময় নেতৃত্ব প্রদান এবং একজন ব্যক্তির ওপর অতিরিক্ত নির্ভরতার প্রবণতা অভ্যন্তরীণ জবাবদিহি প্রক্রিয়াকে দুর্বল করে। এক ব্যক্তি দীর্ঘ সময় নেতৃত্বে থাকার কারণে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া, কৌশল নির্ধারণ কিংবা বিকল্প নেতৃত্ব বিকাশের সম্ভাবনা সংকুচিত হয়ে পড়ে।

অন্যদিকে, সাম্প্রতিক সময়ে যেসব দলে নেতৃত্ব নির্বাচনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে, তারা জাতীয় সম্মেলন আয়োজন করলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী দলীয় প্রধানকেই পুনর্নির্বাচিত করেছে। রাজনৈতিক দলগুলোর এই চর্চা প্রমাণ করে যে, রাজনৈতিক দলগুলোর ক্ষেত্রে নেতৃত্ব নির্বাচন বিষয়ে আনুষ্ঠানিক প্রক্রিয়া বিদ্যমান থাকলেও সেগুলো মূলত নেতৃত্ব পরিবর্তনের কার্যকর প্রক্রিয়া নয়; বরং বিদ্যমান নেতৃত্বকে বৈধতা দেওয়ার একটি প্রাতিষ্ঠানিক উপায়ে পরিণত হয়েছে। দলীয় জাতীয় সম্মেলন আয়োজন করা হলেও নেতৃত্বের প্রকৃত পরিবর্তনের অনুপস্থিতি জবাবদিহি বা প্রতিযোগিতা নিশ্চিত করে কার্যকর নয়। একই সঙ্গে দীর্ঘ সময় ধরে এক ব্যক্তির নেতৃত্ব দ্বিতীয় স্তরের নেতৃত্ব বিকাশকেও সীমিত করে। দশকের পর দশক একই নেতৃত্ব অপরিবর্তিত থাকলে সংগঠনের ভেতরে উদ্ভাবন, বিতর্ক ও বিকল্প নীতিগত অবস্থানের সুযোগ সংকুচিত হয়। সম্ভাব্য নেতারা হয় বিদ্যমান নেতৃত্বের সঙ্গে নিঃশর্তভাবে যুক্ত হন, নয়তো দলীয় কাঠামোয় প্রান্তিক হয়ে পড়েন। এর ফলস্বরূপ দল রাজনৈতিক প্রভাব হারায় এবং সাংগঠনিক স্থিতির তাই হয়। বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলসমূহে একই ব্যক্তি বারবার দলীয় প্রধান হিসেবে নির্বাচিত হওয়ার ক্ষেত্রে প্রচলিত যুক্তি হলো, “শীর্ষ নেতার ব্যক্তিগত প্রভাব ও কর্তৃত্বের সঙ্গে রাজনৈতিক দলের সাংগঠনিক ঐক্য, জনসমর্থন এবং রাজনৈতিক কার্যকারিতা

নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত। নেতৃত্ব পরিবর্তন দলীয় বিভাজন, অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব বা রাজনৈতিক দুর্বলতার ঝুঁকি তৈরি করতে পারে” বলে ধারণা করা হয়।

সার্বিকভাবে বলা যায়, বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলোর নেতৃত্ব নির্বাচন প্রক্রিয়া ও মেয়াদের সময়কাল অভ্যন্তরীণ দলীয় গণতন্ত্র চর্চার দুর্বলতাকেই উন্মোচন করে। দীর্ঘস্থায়ী নেতৃত্বের আধিপত্য, সীমিত আকারে নেতৃত্ব পরিবর্তন এবং প্রতীকী নেতৃত্ব নির্বাচন প্রক্রিয়া মূলত দুর্বল প্রাতিষ্ঠানিক ও জবাবদিহিতার অভাবকে প্রতিফলিত করে। ফলে, বাংলাদেশের সকল রাজনৈতিক দলগুলোর অভ্যন্তরে সুশাসন নিশ্চিত করার মতো গণতান্ত্রিক সংগঠনিক কার্যক্রম পরিচালনা করতে ব্যর্থ হয়েছে।

রাজনৈতিক দলসমূহের কেন্দ্রীয় কমিটি গঠন

রাজনৈতিক দলসমূহের কেন্দ্রীয় কমিটি দলীয় নীতিনির্ধারণ, সাংগঠনিক তদারকি এবং নেতৃত্বের জবাবদিহি নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে অভ্যন্তরীণ সাংগঠনিক কাঠামোর অন্যতম প্রধান স্তম্ভ। রাজনৈতিক দলগুলোর প্রাতিষ্ঠানিক ধারাবাহিকতা, সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়াগত বৈধতা এবং অভ্যন্তরীণ গণতান্ত্রিক চর্চা নিশ্চিত করার জন্য একটি কার্যকর, নিয়মতান্ত্রিক ও প্রতিনিধিত্বশীল কেন্দ্রীয় কমিটির উপস্থিতি থাকা অপরিহার্য। গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত দলগুলোর গঠনতন্ত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, সব রাজনৈতিক দল কেন্দ্রীয় কমিটির মেয়াদ সম্পর্কে সুস্পষ্ট বিধান উল্লেখ করেনি। রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে তিনটি দল-রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন, বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস এবং খেলাফত মজলিসের গঠনতন্ত্রে কেন্দ্রীয় কমিটির মেয়াদ সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ নেই। তবে বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস ও খেলাফত মজলিসের ক্ষেত্রে আমিরা মজলিসের মেয়াদ দুই বছর নির্ধারিত থাকলেও কেন্দ্রীয় কমিটির মেয়াদ সম্পর্কে পৃথক কোনো বিধানের উল্লেখ নেই। গঠনতন্ত্রে কেন্দ্রীয় কমিটি সংক্রান্ত এই ধরনের অস্পষ্টতা মূলত কেন্দ্রীয় কমিটির নবায়ন, নেতৃত্বের জবাবদিহি এবং সাংগঠনিক কার্যক্রমকে দুর্বল করে। ফলে কেন্দ্রীয় কমিটির মেয়াদ ও পুনর্গঠন বিষয়ে অনিশ্চয়তার সুযোগ থাকার কারণে দলীয় প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ ও নিয়মতান্ত্রিক অভ্যন্তরীণ কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে স্থবিরতা তৈরির সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়।

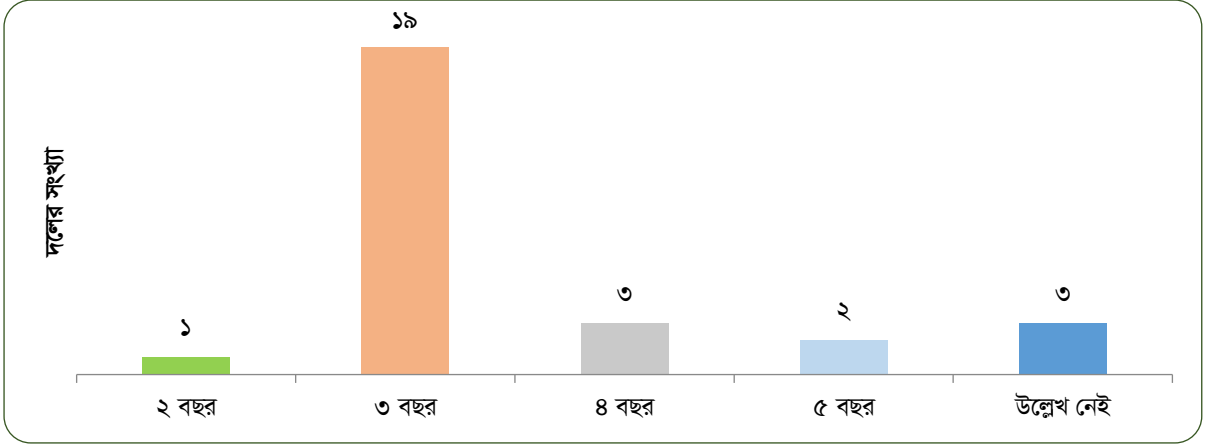
সারণি ১২: গঠনতন্ত্রে কেন্দ্রীয় কমিটির মেয়াদ উল্লেখ না থাকা দলসমূহ

ক্রম	রাজনৈতিক দলের নাম	কেন্দ্রীয় কমিটির মেয়াদ
১	রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন	উল্লেখ নেই
২	বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস	উল্লেখ নেই তবে আমিরা মজলিসের মেয়াদ ২ বছর
৩	খেলাফত মজলিস	উল্লেখ নেই তবে আমিরা মজলিসের মেয়াদ ২ বছর

বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের গঠনতন্ত্রে কেন্দ্রীয় কমিটির মেয়াদের উল্লেখ না থাকার পাশাপাশি কেন্দ্রীয় কমিটি গঠনের প্রক্রিয়া সম্পর্কে উল্লেখ নেই। গঠনতন্ত্র পর্যালোচনা করা ২৮টি দলের মধ্যে ১৯টি দলের কেন্দ্রীয় কমিটির মেয়াদ তিন বছর, তিনটি দলের চার বছর, দুটি দলের পাঁচ বছর এবং একটি দলের দুই বছর নির্ধারিত রয়েছে। কেন্দ্রীয় কমিটি গঠনের পদ্ধতি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, ২৪টি দলের ক্ষেত্রে জাতীয় কাউন্সিল, পার্টি কংগ্রেস বা মজলিসে শূরার প্রতিনিধিদের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় কমিটি নির্বাচনের বিধান রয়েছে। তিনটি দলের ক্ষেত্রে সাধারণ সদস্য বা সাধারণ পরিষদের গোপন ভোটে কেন্দ্রীয় কমিটি নির্বাচনের বিধান পাওয়া যায়। তবে একটি দলের গঠনতন্ত্রে কেন্দ্রীয় কমিটি গঠনের পদ্ধতি সম্পর্কে কোনো সুস্পষ্ট তথ্য উল্লেখ করা হয়নি। তবে কেন্দ্রীয় কমিটির মেয়াদ ও গঠনপ্রক্রিয়া গঠনতন্ত্রে উল্লেখ থাকা সত্ত্বেও এ বিধানসমূহের কার্যকর প্রয়োগ ও চর্চার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়েছে। ফলে আনুষ্ঠানিকভাবে গণতান্ত্রিক কাঠামো বিদ্যমান থাকলেও বাস্তবে কেন্দ্রীয় কমিটি গঠন ও নবায়ন প্রক্রিয়া সবসময় নিয়মতান্ত্রিক, প্রতিযোগিতামূলক বা অংশগ্রহণমূলকভাবে পরিচালিত হয় না।

রাজনৈতিক দলগুলোর কেন্দ্রীয় কমিটি গঠনতান্ত্রিক বিধান অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ে পুনর্গঠিত না হওয়ার অন্যতম প্রধান কারণ হলো রাজনৈতিক দলগুলোর নিয়মিত জাতীয় কাউন্সিল বা সম্মেলন আয়োজন না করা। ফলে গঠনতন্ত্রে কেন্দ্রীয় কমিটির মেয়াদ নির্ধারিত থাকলেও অনেক ক্ষেত্রে নির্ধারিত সময় শেষে কমিটির নবায়ন বা পুনর্গঠন সম্পন্ন হয় না। কেন্দ্রীয় কমিটির নিয়মিত নবায়ন ও সক্রিয় কার্যক্রমের অভাবে নেতৃত্বের বা কমিটির কার্যকর তদারকি ও জবাবদিহি নিশ্চিত হয় না। ফলে কেন্দ্রীয় কমিটি স্বাধীন নীতিনির্ধারণী ও তদারকি কাঠামো হিসেবে গড়ে ওঠার পরিবর্তে শীর্ষ নেতৃত্বের সিদ্ধান্ত অনুমোদনের একটি আনুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হওয়ার ঝুঁকি রয়েছে।

চিত্র ৩: রাজনৈতিক দলসমূহের কেন্দ্রীয় কমিটির মেয়াদ



সামগ্রিকভাবে, কেন্দ্রীয় কমিটির কাঠামোগত দুর্বলতা রাজনৈতিক দলগুলোর অভ্যন্তরীণ গণতান্ত্রিক চর্চাকে সীমিত করেছে। কেন্দ্রীয় কমিটি যেখানে নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ, সাংগঠনিক তদারকি এবং দলীয় কর্মকাণ্ডের ওপর জবাবদিহি নিশ্চিত করার মাধ্যমে দলের প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি শক্তিশালী করার কথা, সেখানে কেন্দ্রীয় কমিটির মেয়াদ ও গঠন প্রক্রিয়া সংক্রান্ত গঠনতান্ত্রিক সীমাবদ্ধতার পাশাপাশি বিদ্যমান বিধানের যথাযথ অনুসরণ না করার কারণে রাজনৈতিক দলগুলো শীর্ষ নেতৃত্ব নির্ভর হয়ে উঠছে। প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোতে ব্যক্তিকেন্দ্রিক নেতৃত্বের প্রাধান্য বৃদ্ধি পাওয়ার মাধ্যমে জবাবদিহি, ক্ষমতার ভারসাম্য ও অভ্যন্তরীণ গণতন্ত্রের বিকাশ সীমিত করেছে।

রাজনৈতিক দলসমূহের স্থানীয় কমিটি গঠন

রাজনৈতিক দলগুলোর সাংগঠনিক বিস্তার, তৃণমূল পর্যায়ে প্রতিনিধিত্ব এবং অভ্যন্তরীণ জবাবদিহি নিশ্চিত করার গুরুত্বপূর্ণ প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো হচ্ছে স্থানীয় কমিটি। রাজনৈতিক দলগুলোর নিয়মিত সাংগঠনিক কার্যক্রম পরিচালনা, সদস্যদের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ, নতুন নেতৃত্বের বিকাশ এবং দলীয় সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে স্থানীয় কমিটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। একই সঙ্গে দলীয় নীতি, কর্মসূচি ও নেতৃত্বের প্রতি তৃণমূল পর্যায়ে জবাবদিহি ও অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার অন্যতম মাধ্যম।

গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত রাজনৈতিক দলগুলোর গঠনতন্ত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, স্থানীয় কমিটি গঠনের ক্ষেত্রে অধিকাংশ দলের গঠনতন্ত্রে নির্দিষ্ট মেয়াদ ও গঠনপ্রক্রিয়া উল্লেখ রয়েছে। গবেষণায় ২৮টি দলের গঠনতন্ত্র পর্যালোচনা করা হয়েছে যার মধ্যে ১১টি দলের স্থানীয় কমিটির মেয়াদ দুই বছর, ১০টি দলের তিন বছর, একটি দলের এক বছর এবং তিনটি দলের ক্ষেত্রে পরবর্তী জাতীয় কাউন্সিল অনুষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত স্থানীয় কমিটি বহাল থাকার বিধান রয়েছে। তবে দুইটি দলের (নাগরিক ঐক্য ও রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন) স্থানীয় কমিটির মেয়াদ সম্পর্কে গঠনতন্ত্রে উল্লেখ নেই। স্থানীয় কমিটি গঠনের পদ্ধতি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, অধিকাংশ দলের ক্ষেত্রে স্থানীয় কাউন্সিল বা সংশ্লিষ্ট পর্যায়ের সদস্যদের মাধ্যমে স্থানীয় কমিটি নির্বাচনের বিধান রয়েছে। তবে একটি দলের (বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি) স্থানীয় কমিটির গঠনের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় কমিটি দ্বারা নিয়মাবলী নির্ধারণের কথা বলা হয়েছে।

সামগ্রিকভাবে দেখা যায় যে, অধিকাংশ রাজনৈতিক দলের গঠনতন্ত্রে স্থানীয় কমিটি গঠনের জন্য অংশগ্রহণমূলক ও প্রতিনিধিত্বশীল কাঠামো বিদ্যমান। তবে কিছু দলের ক্ষেত্রে স্থানীয় কমিটির মেয়াদ নির্ধারণ না করা ও কমিটি গঠনের ক্ষমতা কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের ওপর নির্ভরশীল করার মাধ্যমে স্থানীয় পর্যায়ের সাংগঠনিক স্বায়ত্তশাসন ও অভ্যন্তরীণ গণতান্ত্রিক চর্চাকে সীমিত করা রয়েছে।

রাজনৈতিক দলসমূহের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া

রাজনৈতিক দলে অভ্যন্তরীণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া দলীয় সুশাসন এবং অভ্যন্তরীণ গণতন্ত্রের অন্যতম মৌলিক উপাদান। অভ্যন্তরীণ সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাধ্যমে রাজনৈতিক দলগুলোর দলীয় নীতি, রাজনৈতিক কৌশল, সাংগঠনিক কর্মপরিকল্পনা এবং গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক অবস্থান নির্ধারিত হয়। তাই সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া মাধ্যমেই রাজনৈতিক দলগুলো নিজেদের মধ্যে দলীয় বৈধতা, ঐকমত্য নির্মাণ এবং সাংগঠনিক সংহতি গড়ে তোলার সাংগঠনিক মাধ্যম হিসেবে বিবেচিত হয়। তাই রাজনৈতিক দলের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার কাঠামো, ক্ষমতার বন্টন এবং চর্চা বিশ্লেষণ অভ্যন্তরীণ গণতন্ত্র, জবাবদিহি এবং প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতার জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত রাজনৈতিক দলগুলোর গঠনতন্ত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য জাতীয় কাউন্সিল, জাতীয় স্থায়ী কমিটি, কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটি, উপদেষ্টা পরিষদ, মনোনয়ন বোর্ড এবং স্থানীয় কমিটিসহ একাধিক প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর বিধান রয়েছে। দলীয় গঠনতন্ত্রে জাতীয় কাউন্সিলকে সর্বোচ্চ নীতিনির্ধারণী ফোরাম হিসেবে বিবেচনা করা হয়। রাজনৈতিক দলগুলোর জাতীয় কাউন্সিলের মাধ্যমেই দলীয় গঠনতন্ত্র সংশোধন, নেতৃত্ব নির্বাচন, আর্থিক প্রতিবেদন অনুমোদন এবং গুরুত্বপূর্ণ নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকে। একইভাবে, কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটি দলীয় কার্যক্রম পরিচালনা, সাংগঠনিক সমন্বয় এবং বিভিন্ন স্তরের কমিটি অনুমোদনের দায়িত্ব পালন করে। অন্যদিকে স্থানীয় কমিটিগুলো স্থানীয় পর্যায়ে দলীয় কর্মসূচি বাস্তবায়ন, সাংগঠনিক সম্প্রসারণ এবং সদস্য সংগ্রহের দায়িত্ব পালন করে। গবেষণায় দেখা যায়, ১৬টি রাজনৈতিক দলের জাতীয় কাউন্সিল নিয়মিত অনুষ্ঠিত হয় না এবং

অধিকাংশ ক্ষেত্রে এসব সভা পূর্বনির্ধারিত সিদ্ধান্ত অনুমোদনের আনুষ্ঠানিক প্ল্যাটফর্ম হিসেবে ব্যবহৃত হয়। একইভাবে, কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটি ও অন্যান্য নীতিনির্ধারণী কাঠামো সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার অংশ হলেও বাস্তবে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা প্রায়ই শীর্ষ নেতৃত্ব বা দলীয় প্রধানের হাতে কেন্দ্রীভূত থাকে। অনেক ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী কমিটিগুলোর ভূমিকা স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পরিবর্তে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের সিদ্ধান্ত অনুমোদন ও বাস্তবায়নের মধ্যে সীমাবদ্ধ রয়েছে। ফলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর চেয়ে ব্যক্তিগত প্রভাব ও নেতৃত্বের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

অন্যদিকে, জেলা, উপজেলা এবং ওয়ার্ড পর্যায়ে কমিটিগুলো মূলত কেন্দ্রীয় সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন, নির্বাচনী কার্যক্রম পরিচালনা এবং সাংগঠনিক বিস্তারে ভূমিকা পালন করে। নীতি প্রণয়ন, কৌশল নির্ধারণ বা গুরুত্বপূর্ণ সাংগঠনিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে তৃণমূল পর্যায়ের মতামত প্রতিফলিত হওয়ার সুযোগ সীমিত। এর ফলে তৃণমূল ও কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের মধ্যে অংশগ্রহণমূলক সিদ্ধান্ত গ্রহণের পরিবর্তে নিম্নমুখী ও কেন্দ্রীয় কমিটি নির্ভর সিদ্ধান্ত গ্রহণের সাংগঠনিক সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে।

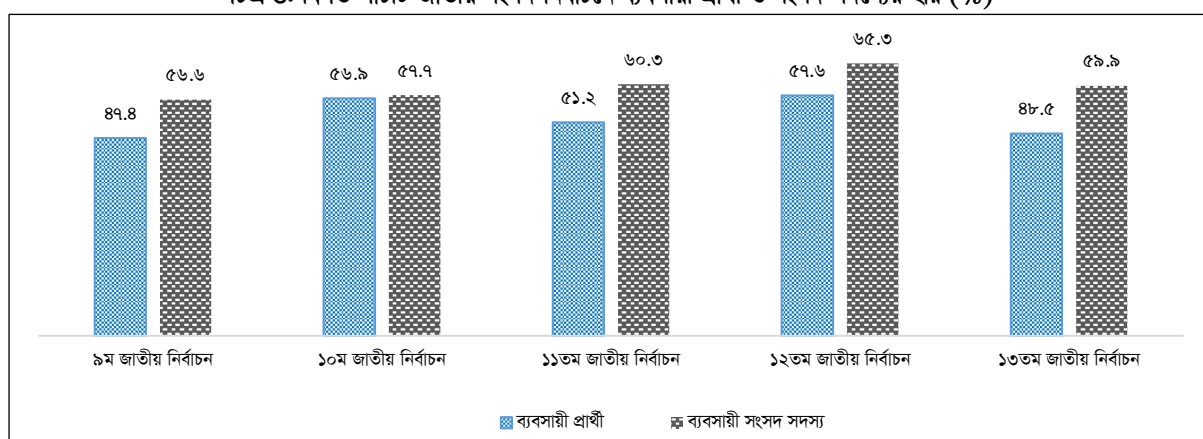
পরিশেষে বলা যায় যে, রাজনৈতিক দলগুলোর সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য আনুষ্ঠানিক প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো বিদ্যমান থাকলেও বাস্তব চর্চায় সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা উল্লেখযোগ্যভাবে শীর্ষ নেতৃত্বকেন্দ্রিক। ফলে দলীয় অভ্যন্তরীণ গণতন্ত্র, অংশগ্রহণমূলক নীতিনির্ধারণ এবং নেতৃত্বের জবাবদিহি নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে বিদ্যমান কাঠামোগুলো কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারছে না।

নির্বাচনে প্রার্থী মনোনয়ন প্রক্রিয়া

গবেষণায় দেখা যায়, রাজনৈতিক দলগুলোর অভ্যন্তরীণ গণতন্ত্র চর্চার ক্ষেত্রে নির্বাচনে প্রার্থী মনোনয়ন একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র হলেও এ প্রক্রিয়ায় তৃণমূল পর্যায়ের মতামত ও অংশগ্রহণের সুযোগ সীমিত। গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২-এর ধারা ৯০(১)(খ) (ঈ)-এ জাতীয় নির্বাচনে দল থেকে প্রার্থী মনোনয়ন প্রদানের ক্ষেত্রে নির্বাচনী এলাকার স্থানীয় পর্যায়ের কমিটির প্রস্তাবিত প্রার্থীদের প্যানেল বিবেচনার কথা বলা হলেও বাস্তবে অধিকাংশ দলের ক্ষেত্রে প্রার্থী মনোনয়নে স্থানীয় পর্যায়ের মতামত গুরুত্ব পায় না। বরং প্রার্থী মনোনয়নের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের সিদ্ধান্তেই নির্বাচনে দলীয় প্রার্থী মনোনীত হয়ে থাকে।

রাজনৈতিক দলগুলোর গঠনতন্ত্রে প্রার্থী মনোনয়নের জন্য কোনো সুস্পষ্ট, স্বচ্ছ ও নির্দিষ্ট যোগ্যতা ও অযোগ্যতার মানদণ্ড উল্লেখ নেই। ছয়টি দলের গঠনতন্ত্রে মনোনয়ন দেওয়ার শর্ত হিসেবে “যোগ্যতা”, “জনপ্রিয়তা”, “সততা”, “দলের প্রতি আনুগত্য” ইত্যাদি বিষয় উল্লেখ করা হলেও এসব ক্ষেত্রে অস্পষ্টতা রয়েছে। ফলে প্রার্থী নির্বাচনের প্রক্রিয়া প্রাতিষ্ঠানিক ও পূর্বনির্ধারিত মানদণ্ডের পরিবর্তে নেতৃত্বের বিবেচনায় মনোনয়ন দেওয়া হয়ে থাকে। বিশেষ করে, সংশ্লিষ্ট নির্বাচনী আসনে প্রার্থীর জনপ্রিয়তা বা স্থানীয় পর্যায়ে গ্রহণযোগ্যতার পাশাপাশি দলীয় প্রধানের প্রতি প্রশ্রুত আনুগত্যকে গুরুত্বপূর্ণ ‘মানদণ্ড’ হিসেবে দেখা হয়। একই সঙ্গে বড় দলগুলোর ক্ষেত্রে প্রার্থী মনোনয়নে অর্থ ও পেশিজ্ঞান, স্থানীয় পর্যায়ে প্রভাব-প্রতিপত্তিকে যোগ্যতার মানদণ্ড হিসেবে বিবেচনা করার প্রবণতা রয়েছে। যার দৃষ্টান্ত হিসেবে উল্লেখ করা যায় যে, বিগত পাঁচটি জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দলগুলো থেকে ব্যবসায়ী প্রার্থী ও ব্যবসায়ী সংসদ সদস্যের উল্লেখযোগ্য হার লক্ষ করা যায় (চিত্র ৪)। বিশেষ করে প্রভাবশালী রাজনৈতিক দলগুলোতে নির্বাচনী প্রার্থী মনোনয়নে প্রার্থীর অর্থ-প্রতিপত্তি ও ব্যবসায়ীদের অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়। এছাড়া প্রভাবশালী তিনটি দলে (বিএনপি, আওয়ামী লীগ ও জাতীয় পার্টি) নির্বাচনী প্রার্থী বাছাইয়ে মনোনয়ন বাণিজ্যের অভিযোগও বিভিন্ন উৎস থেকে পাওয়া যায়।

চিত্র ৪: বিগত পাঁচটি জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ব্যবসায়ী প্রার্থী ও সংসদ সদস্যের হার (%)



প্রার্থী মনোনয়ন প্রক্রিয়ায় তৃণমূলের অংশগ্রহণের সাংগঠনিক কাঠামো থাকলেও তাদের ভূমিকা মূলত আনুষ্ঠানিক পর্যায়ে সীমাবদ্ধ থাকে। সরাসরি মনোনয়ন বোর্ডের সাক্ষাৎকার ও আলোচনার ভিত্তিতে প্রার্থী বাছাইয়ের ক্ষেত্রে দলীয় প্রধানের মতামতকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়। মনোনয়ন প্রক্রিয়ায় রাজনৈতিক দলগুলোর এই চর্চা মূলত দলের অভ্যন্তরে স্থানীয় সংগঠন ও সদস্যদের মতামত প্রতিফলনের সুযোগ সংকুচিত হয়েছে এবং প্রার্থী মনোনয়নের সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ নেতৃত্বকেন্দ্রিক প্রক্রিয়ায় পরিণত হয়েছে।

নির্বাচনে প্রার্থী মনোনয়নের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট আসনে প্রার্থীর দলের প্রতি অবদান, জনস্পৃহতা, রাজনৈতিক গ্রহণযোগ্যতা বা নির্বাচনী সক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও দলীয় নেতৃত্বের প্রতি আনুগত্যকে অনেক ক্ষেত্রে অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়। বিশেষত বৃহৎ রাজনৈতিক দলগুলোতে প্রার্থী নির্বাচনের ক্ষেত্রে অর্থ ও পেশিশক্তি গুরুত্ব পাওয়ার কারণে মনোনয়ন প্রক্রিয়ার সমতা, স্বচ্ছতা ও প্রতিযোগিতা নিশ্চিত হয় না। অন্যদিকে, ২০১৩ সালে গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২-এর ধারা ১২(১)(এ) সংশোধনের মাধ্যমে দলীয় প্রার্থী হওয়ার ক্ষেত্রে ন্যূনতম তিন বছর দলের সক্রিয় সদস্য থাকার শর্ত বাতিল করা হয়। এর ফলে প্রার্থী মনোনয়নের ক্ষেত্রে দীর্ঘদিনের দলীয় সম্পৃক্ততা বা সাংগঠনিক অভিজ্ঞতার মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে বাধ্যতামূলক যোগ্যতা হিসেবে বিবেচিত হওয়ার সুযোগ সীমিত করা হয়েছে।

সামগ্রিকভাবে, বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলোর প্রার্থী মনোনয়ন প্রক্রিয়া যথাযথ প্রাতিষ্ঠানিক, স্বচ্ছ, অংশগ্রহণমূলক ও পূর্বনির্ধারিত মানদণ্ডভিত্তিক হয়ে ওঠেনি। বরং কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের প্রভাব, দলীয় আনুগত্য, ব্যক্তিগত জনপ্রিয়তা এবং অর্থ ও প্রভাব-প্রতিপত্তির মতো অনানুষ্ঠানিক উপাদান প্রার্থী নির্বাচনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

অংশগ্রহণ ও অন্তর্ভুক্তি

দলের কেন্দ্রীয় কমিটিতে নারী সদস্যদের অন্তর্ভুক্তি

আরপিও, ১৯৭২ এর ধারা ৯০খ(১)(খ)-এ বলা হয়েছে-

“উপ-দফা (ক) এ বর্ণিত শর্ত প্রতিপালন ব্যতীত নিবন্ধনে আগ্রহী রাজনৈতিক দলের দলীয় গঠনতন্ত্রে নিম্নরূপ সুস্পষ্ট বিধান থাকিতে হইবে, যথা: (আ) কেন্দ্রীয় কমিটিসহ সকল পর্যায়ের কমিটিতে ন্যূনতম শতকরা ৩৩ ভাগ সদস্য পদ মহিলা সদস্যদের জন্য সংরক্ষণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত থাকা এবং এই লক্ষ্যমাত্রা পর্যায়ক্রমে ২০৩০ সালের মধ্যে অর্জন করা”।

অর্থাৎ নিবন্ধিত ও নিবন্ধন প্রত্যাশী রাজনৈতিক দলগুলোর সকল পর্যায়ের কমিটিতে ন্যূনতম ৩৩শতাংশ সদস্যপদ নারীদের জন্য সংরক্ষণের বাধ্যবাধকতা রয়েছে এবং ২০৩০ সালের মধ্যে পর্যায়ক্রমে এই লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু বাস্তবে দলগুলোর কেন্দ্রীয় কমিটিতে সংশ্লিষ্ট দলের নারী সদস্যদের প্রতিনিধিত্ব বিশ্লেষণ করলে আইনের এই ধারা পরিপালনে ব্যাপক ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়। গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত ৪টি রাজনৈতিক দল (বাংলাদেশ লেবার পার্টি, রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন, বাংলাদেশ জাস্টিস পার্টি, বিকল্পধারা বাংলাদেশ) তাদের সংশ্লিষ্ট গঠনতন্ত্রে আরপিও-র এই বিধান অনুযায়ী ৩৩ শতাংশ নারীদের দলীয় সদস্যপদ সংরক্ষণের লক্ষ্যমাত্রাই নির্ধারণ করেনি। অপর দুইটি রাজনৈতিক দলের (বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী এবং বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস) গঠনতন্ত্রে এই সংক্রান্ত লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হলেও সংশ্লিষ্ট দলের কেন্দ্রীয় কমিটিতে একজনও নারী সদস্য নেই। এছাড়াও একটি দলের (খেলাফত মজলিস) কেন্দ্রীয় কমিটিতে সকল পুরুষ সদস্যের নাম স্পষ্টভাবে প্রকাশ করা হলেও ৩৭ জন নারী সদস্যের মধ্যে শুধু দুইজন সদস্যের নাম প্রকাশ করা এবং বাকিদের ক্ষেত্রে কেবল ‘৩৫ জন নারী সদস্য’ রয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। অন্যদিকে জাকের পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটিতে মাত্র একজন নারী কর্মীকে পাঁচটি ভিন্ন পদে তালিকাভুক্ত করে পাঁচবার গণনা করা হয়েছে।

সারণি ১৩: রাজনৈতিক দলের কেন্দ্রীয় কমিটিতে সংশ্লিষ্ট দলের নারী সদস্যদের উপস্থিতি (%)

কেন্দ্রীয় কমিটিতে নারী সদস্যদের উপস্থিতি (%)	রাজনৈতিক দলের সংখ্যা
৩৩% বা এর অধিক	২টি
২১-৩২%	১টি
১১-২০%	১২টি
১-১০%	৯টি
০%	২টি
তথ্য প্রকাশ করেনি	৬টি

গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ অনুযায়ী (সারণি ১৩), দলের কেন্দ্রীয় কমিটিতে আরপিও-র নির্ধারিত ৩৩ শতাংশ বা তার অধিক নারীদের উপস্থিতি আশাব্যঞ্জক নয়। মাত্র দুইটি রাজনৈতিক দল এই লক্ষ্যমাত্রা নিশ্চিত করতে পেরেছে। অন্যদিকে ২১ থেকে ৩২ শতাংশ নারী সদস্যের উপস্থিতি রয়েছে মাত্র একটি দলে এবং ১১ থেকে ২ শতাংশ নারী সদস্য অন্তর্ভুক্ত করতে পেরেছে ১২ টি দল। নয়টি রাজনৈতিক দলের কেন্দ্রীয় কমিটিতে নারী সদস্যের উপস্থিতি অতি নগণ্য-মাত্র ১ থেকে ১০ শতাংশের মধ্যে সীমাবদ্ধ এবং ৬টি রাজনৈতিক দল তাদের কেন্দ্রীয় কমিটিতে নারী সদস্যদের উপস্থিতি সংক্রান্ত কোনো তথ্যই প্রকাশ করেনি। এছাড়াও কেন্দ্রীয় কমিটি ব্যতীত দলগুলোর অন্যান্য কমিটিতে নারী সদস্যদের অন্তর্ভুক্তি বিষয়ক তথ্য প্রকাশ করা হয় না এবং গবেষণায় এসম্পর্কিত তথ্য দলগুলো থেকে পাওয়া যায়নি। সার্বিকভাবে, উপরোক্ত তথ্য-উপাত্ত থেকে প্রতীয়মান হয় যে, দলগুলোর বিভিন্ন পর্যায়ের কমিটিতে ২০৩০ সালের মধ্যে ৩৩ শতাংশ নারী প্রতিনিধির অন্তর্ভুক্তি অর্জনের যে আইনি অঙ্গীকার রয়েছে, রাজনৈতিক দলগুলোর বিদ্যমান কাঠামোগত চর্চার কারণে তা বাস্তবায়নের পথ চ্যালেঞ্জ ও প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন। অধিকাংশ দলের বিভিন্ন পর্যায়ের কমিটিতে শুধুমাত্র আইনের পরিপালনের জন্য প্রতীকী অর্থে নারী সদস্য অন্তর্ভুক্তি করার প্রবণতা লক্ষ করা গেছে।

সারণি ১৪: দলভিত্তিক কেন্দ্রীয় কমিটিতে নারী সদস্যদের উপস্থিতি (%)

ক্রম	রাজনৈতিক দলের নাম	নারী সদস্যের সংখ্যা (%)	ক্রম	রাজনৈতিক দলের নাম	নারী সদস্যের সংখ্যা (%)
১	বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস	০%	১৭	জাতীয় পার্টি	১২%
২	বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী	০%	১৮	গণসংহতি আন্দোলন	১৪%
৩	ইসলামী ঐক্যজোট	১%	১৯	বাংলাদেশ জাস্টিস পার্টি	১৪%
৪	আমার বাংলাদেশ পার্টি (এবি পার্টি)	২%	২০	বাংলাদেশ লেবার পার্টি	১৬%
৫	খেলাফত মজলিস*	২%	২১	বাংলাদেশের বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টি	১৭%
৬	বাংলাদেশ মুসলিম লীগ	৪%	২২	নাগরিক ঐক্য	১৭%
৭	বাংলাদেশ কল্যাণ পার্টি	৫%	২৩	জাকের পার্টি	১৯%
৮	ন্যাশনাল পিপলস পার্টি (এনপিপি)	৬%	২৪	গণফোরাম	১৯%
৯	জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশ	৮%	২৫	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ (বর্তমানে কার্যক্রম নিষিদ্ধ)	২২%
১০	বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টি	৯%	২৬	লিবারেল ডেমোক্রটিক পার্টি	৩৪%
১১	রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন	১০%	২৭	জাতীয় গণতান্ত্রিক পার্টি	৪১%
১২	জাতীয় নাগরিক পার্টি	১০%	২৮	বাংলাদেশ মুসলিম লীগ-বিএমএল	তথ্য পাওয়া যায়নি
১৩	বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিবি)	১২%	২৯	জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক আন্দোলন-এনডিএম	তথ্য পাওয়া যায়নি
১৪	ভাসানী জনশক্তি পার্টি	১২%	৩০	বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (বাংলাদেশ ন্যাপ)	তথ্য পাওয়া যায়নি
১৫	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল-বিএনপি	১২%	৩১	বাংলাদেশ মাইনরিটি জনতা পার্টি (বিএমজেপি)	তথ্য পাওয়া যায়নি
১৬	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ)	১২%	৩২	বিকল্পধারা বাংলাদেশ	তথ্য পাওয়া যায়নি

নির্বাচনে নারী প্রার্থী মনোনয়ন

জাতীয় সংসদে নারীরা সাধারণত সরাসরি নির্বাচনে জয়লাভ ও সংরক্ষিত নারী আসনে রাজনৈতিক দল কর্তৃক মনোনীত হওয়ার মাধ্যমে প্রতিনিধিত্ব করেন। তবে সরাসরি নির্বাচনে নারী প্রার্থী মনোনয়ন প্রদানের ক্ষেত্রে দলগুলোর মধ্যে এক ধরনের অনীহা ও কাঠামোগত অন্তরায় লক্ষ্যনীয়। অধিকাংশ রাজনৈতিক দলই সরাসরি নির্বাচনে নারীদের মনোনয়ন দিতে অনগ্রহী এবং মনোনয়ন না দেওয়ার অজুহাত হিসেবে দলগুলো “যোগ্য নারী প্রার্থীর অভাব” ও “নারীরা সক্রিয় রাজনীতিতে কম আগ্রহী” বলে দাবি করেছে। কিন্তু বাস্তবে রাজনৈতিক দলগুলোর অভ্যন্তরীণ মনোনয়ন ব্যবস্থার পুরুষতান্ত্রিক সংস্কৃতি ও সুযোগের অভাবই নারীদের সরাসরি নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার প্রধান প্রতিবন্ধক হিসেবে কাজ করে।

জাতীয় সংসদ নির্বাচনসমূহের পরিসংখ্যানগত চিত্র বিশ্লেষণ করলেও নারীদের সরাসরি মনোনয়নের হতাশাজনক অবস্থা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ২০০৮ সাল থেকে ২০২৬ সালের মধ্যে সর্বশেষ ৫টি জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নারী প্রার্থীর মনোনয়ন সামগ্রিকভাবে ৫ শতাংশেরও কম ছিল। নবম সংসদ নির্বাচনে (২০০৮) মোট ১,৫৬৭ জন প্রার্থীর মধ্যে সরাসরি নারী প্রার্থী ছিলেন মাত্র ৫৯ জন (৩.৭৬%), দশম সংসদে (২০১৪) ৫৪৮ জনের মধ্যে ১৯ জন (৩.৪৭%), একাদশ সংসদে (২০১৮) ১,৮৬১ জনের মধ্যে ৬৮ জন (৩.৬৭%), দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনে (২০২৪) ১,৮৯৬ জনের মধ্যে ৯৪ জন (৪.৯৬%) এবং ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচনে (২০২৬) মোট ২,০২৮ জন প্রার্থীর মধ্যে সরাসরি প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী নারী প্রার্থীর সংখ্যা ছিল মাত্র ৮৩ জন (৪.০৯%)।

সারণি ১৫: সর্বশেষ ৫টি জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নারী প্রার্থীর মনোনয়ন প্রদানের হার

নির্বাচন	সাল	মোট প্রার্থী	নারী প্রার্থী (সরাসরি)	শতকরা হার (%)
নবম সংসদ	২০০৮	১,৫৬৭	৫৯	৩.৭৬%
দশম সংসদ	২০১৪	৫৪৮	১৯	৩.৪৭%
একাদশ সংসদ	২০১৮	১,৮৬১	৬৮	৩.৬৭%
দ্বাদশ সংসদ	২০২৪	১,৮৯৬	৯৪	৪.৯৬%
ত্রয়োদশ সংসদ	২০২৬	২,০২৮	৮৩	৪.০৯%

বিশেষভাবে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দলগুলো অন্তত পাঁচ শতাংশ (৫%) নারী প্রার্থী মনোনয়নের প্রতিশ্রুতি দিয়ে থাকলেও, বাস্তব ক্ষেত্রে রাজনৈতিক দলগুলো সেই নীতিগত অঙ্গীকার পালনে চরমভাবে ব্যর্থ হয়েছে। গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত দলগুলোর মধ্যে এই নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী ১৩টি রাজনৈতিক দলের দলীয় প্রার্থী তালিকায় একজনও নারী প্রার্থী ছিলেন না। অন্যদিকে আরও ১২টি দল নারী প্রার্থী মনোনয়ন দিলেও তাদের মনোনীত প্রার্থীর মোট হারের মাত্র ৩.১ শতাংশ ছিল নারী। পক্ষান্তরে, নারী প্রার্থী মনোনয়ন দেওয়ার ক্ষেত্রে রাজনৈতিক দলগুলোর অনীহা থাকলেও জাতীয় নির্বাচনে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে নারীদের অংশগ্রহণ ছিল উল্লেখযোগ্য ও লক্ষ্যনীয়। ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী স্বতন্ত্র প্রার্থীদের মধ্যে নারী প্রার্থীর হার ছিল ৭.৯ শতাংশ। জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত নারী আসনে মনোনয়নের ক্ষেত্রে নারী কর্মীদের দলের প্রতি অবদান, মেধা, রাজনৈতিক প্রজ্ঞাকে গুরুত্ব না দিয়ে নেতৃত্বের প্রতি আনুগত্য, তোষণনীতি, পারিবারিক পরিচয় ইত্যাদির ভিত্তিতে মনোনয়ন মূলত জাতীয় সংসদে নারীদের প্রতীকী

প্রতিনিধিত্বকে প্রকাশ করে। দলীয় মনোনয়ন ব্যবস্থায় নারীদের প্রতি রাজনৈতিক দলগুলোর এই বৈষম্যমূলক ও অনীহাপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি প্রমাণ করে যে, আইনি বাধ্যবাধকতার কারণে প্রতিশ্রুতি থাকলেও বাস্তবে নারীদের সরাসরি রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্বে অন্তর্ভুক্ত করার সদিচ্ছা দলগুলোর প্রাতিষ্ঠানিক চর্চায় এখনও অনুপস্থিত।

জবাবদিহি ব্যবস্থা

রাজনৈতিক দলগুলোতে তাদের নিজস্ব সাংগঠনিক বৈধতা, গণতান্ত্রিক চরিত্র এবং প্রাতিষ্ঠানিক স্থায়িত্ব নিশ্চিত করার জন্য অভ্যন্তরীণ কার্যক্রমে কার্যকর জবাবদিহি ব্যবস্থা থাকা অপরিহার্য। অভ্যন্তরীণ জবাবদিহি ব্যবস্থা নিশ্চিত করে যে, দলীয় নেতৃত্ব, গঠনতন্ত্র ও সাংগঠনিক বিধিবিধান অনুসারে ক্ষমতার প্রয়োগ, দলীয় সদস্যদের কাছে তাদের সিদ্ধান্ত ও কর্মকাণ্ডের ব্যাখ্যা প্রদান করবে এবং প্রাতিষ্ঠানিক তদারকির আওতায় থাকবে। ফলে, জবাবদিহি কার্যক্রম দলীয় অভ্যন্তরীণ গণতন্ত্র চর্চা বজায় রাখা এবং রাজনৈতিক দলের কার্যক্রম প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

রাজনৈতিক দলের গণতান্ত্রিক বৈধতা নির্বাচনী গ্রহণযোগ্যতার পাশাপাশি তার অভ্যন্তরীণ শাসনব্যবস্থার স্বচ্ছতা, সদস্যভিত্তিক অংশগ্রহণ, অন্তর্ভুক্তিকরণ এবং জবাবদিহি নিশ্চিত করার সক্ষমতার সঙ্গেও নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত (স্কারো, ২০১৫; ক্রস ও কাংজ, ২০১৩)। সুতরাং, প্রত্যাশা করা হয় যে, রাজনৈতিক দলসমূহের অভ্যন্তরে একটি কার্যকর প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর উপস্থিতি থাকবে, যা নেতৃত্বকে সদস্যদের প্রতি জবাবদিহি, সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা, আর্থিক ব্যবস্থাপনার তদারকি এবং নেতৃত্ব নির্বাচন ও সাংগঠনিক কার্যক্রম পরিচালনায় গঠনতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক নীতিমালার যথাযথ অনুসরণ নিশ্চিত করবে।

উন্নয়নশীল গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহে রাজনৈতিক দলের জবাবদিহি নিশ্চিত আনুষ্ঠানিক প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও রাজনৈতিক আচরণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া প্রায়শই প্রভাবিত হয় অনানুষ্ঠানিক ক্ষমতা-সম্পর্ক, পৃষ্ঠপোষকমূলক সম্পর্ক এবং ব্যক্তিকেন্দ্রিক প্রভাব দ্বারা। রাজনৈতিক দলের এই অনানুষ্ঠানিক চর্চা জবাবদিহি ও প্রাতিষ্ঠানিক সুশাসনের কার্যকারিতা দুর্বল করে (হেল্মকে ও লেভিটস্কি, ২০০৬; ও'ডোনেল, ১৯৯৮)। বাংলাদেশ রাজনৈতিক দলগুলো গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশের বিধান অনুসারে লিখিত গঠনতন্ত্র, নির্বাচিত কমিটি, শৃঙ্খলাবিধি এবং আর্থিক প্রতিবেদন দাখিলের ব্যবস্থা গ্রহণ করলেও বাস্তব চর্চায় দেখা যায় যে, এসব আনুষ্ঠানিক কাঠামো অনেক ক্ষেত্রেই কার্যকর জবাবদিহি নিশ্চিত করার পরিবর্তে প্রতীকী ব্যবস্থায় পরিণত হয়েছে। অধিকাংশ গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত দলীয় শীর্ষ নেতৃত্বের হাতে কেন্দ্রীভূত থাকে এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়া প্রায়শই গঠনতান্ত্রিক বিধান অনুসরণের পরিবর্তে মুরুব্বি-মক্কেল সম্পর্ক, ব্যক্তিগত আনুগত্য এবং অভ্যন্তরীণ গোষ্ঠীগত সমঝোতার মাধ্যমে পরিচালিত হয়।

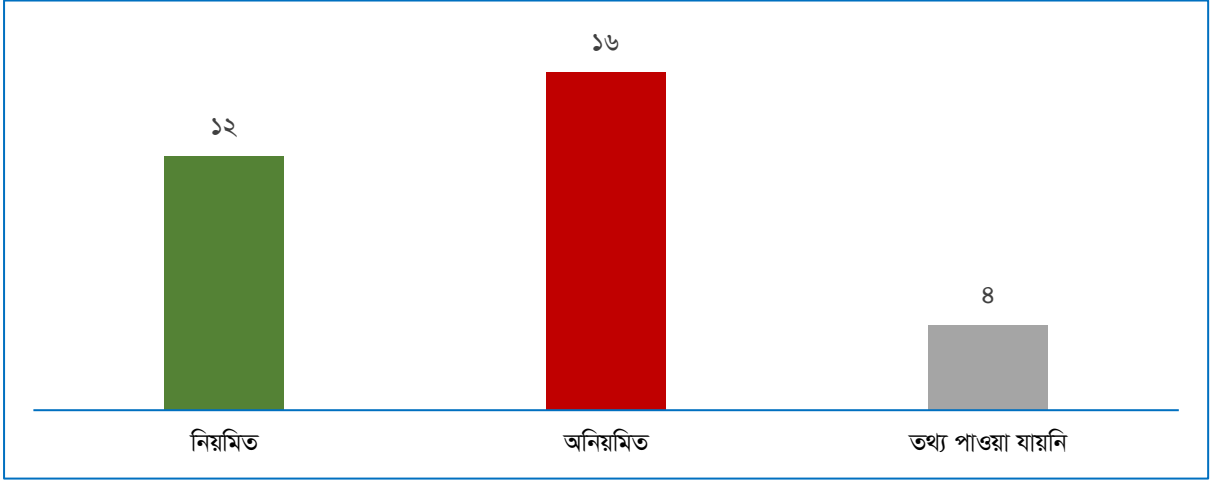
কার্যকর অভ্যন্তরীণ জবাবদিহিতার অনুপস্থিতি রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে সাংগঠনিক সক্ষমতা এবং সামগ্রিক গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার ওপর সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলে। রাজনৈতিক দলের দুর্বল অভ্যন্তরীণ জবাবদিহি ব্যবস্থা নেতৃত্বের দীর্ঘস্থায়ী আধিপত্যকে উৎসাহিত করে, সাংগঠনিক স্বচ্ছতা হ্রাস করে, সদস্যদের অংশগ্রহণ নিরুৎসাহিত করে এবং যোগ্যতার ভিত্তিতে নেতৃত্ব বিকাশের পরিবর্তে ব্যক্তিগত নেতৃত্বকে শক্তিশালী করে। এর ফলে রাজনৈতিক দলসমূহের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা দুর্বল হয় এবং প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রের প্রতি নাগরিকদের আস্থা ক্ষুণ্ণ হয়। ফলে, অভ্যন্তরীণ জবাবদিহি ব্যবস্থা দুর্বলভাবে অনুসরণ করার কারণে রাজনৈতিক দলসমূহ প্রতিনিধিত্ব, নীতিনির্ধারণ এবং শাসনকার্য পরিচালনার ক্ষেত্রে তুলনামূলকভাবে কম কার্যকর ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হয় (রাউাল গেস সাভাসান্দ, ২০০২)।

গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত রাজনৈতিক দলসমূহের গঠনতন্ত্র পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য প্রায় সব দলেই একটি বহুস্তরীয় সাংগঠনিক কাঠামো নির্ধারণ করা হয়েছে। সাধারণত জাতীয় কাউন্সিল, কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটি, স্থায়ী কমিটি বা প্রেসিডিয়াম, এবং বিভিন্ন বিষয়ভিত্তিক উপ-কমিটিকে দলীয় নীতিনির্ধারণ ও সাংগঠনিক পরিচালনার আনুষ্ঠানিক ব্যবস্থা রয়েছে। গঠনতান্ত্রিকভাবে প্রতিষ্ঠিত কমিটিগুলোর উদ্দেশ্য হলো রাজনৈতিক দলের সাংগঠনিক কার্যক্রম পালন করা এবং নেতৃত্ব ও নিজেদের কার্যক্রম সম্পর্কে জানানো, সমষ্টিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ নিশ্চিত করা এবং সদস্যদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে দলীয় অভ্যন্তরীণ জবাবদিহিতা শক্তিশালী করা।

গঠনতন্ত্র অনুযায়ী জাতীয় কাউন্সিল বা জাতীয় দলীয় সম্মেলন, পার্টি কংগ্রেস বা মজলিসে শুরা সর্বোচ্চ নীতিনির্ধারণী ফোরাম হিসেবে বিবেচিত হয়। এই কাউন্সিলের মাধ্যমে দলীয় নেতৃত্ব নির্বাচন, গঠনতন্ত্র সংশোধন, সাংগঠনিক ও আর্থিক প্রতিবেদন অনুমোদন এবং ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক কর্মপন্থা নির্ধারণের বিষয়ক সিদ্ধান্ত জানানো এবং গ্রহণ করা হয়। গবেষণায় বিশ্লেষিত রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে সাংগঠনিক কাঠামো, কমিটির স্তরবিন্যাস এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের আনুষ্ঠানিক বিধানে কিছু পার্থক্য থাকলেও অধিকাংশ দলেই বাস্তব রাজনৈতিক অনুশীলনে ক্ষমতার উচ্চমাত্রার কেন্দ্রীভূত, ব্যক্তিগত নেতৃত্ব, অনানুষ্ঠানিক সমঝোতা সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রকৃত চরিত্র নির্ধারণ করে। এর ফলে আনুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠানসমূহ কার্যকর জবাবদিহি নিশ্চিত করার পরিবর্তে প্রতীকী বা বৈধতা প্রদানকারী কাঠামো হিসেবে কাজ করে।

পাশাপাশি, প্রায় সব দলের গঠনতন্ত্রেই নির্দিষ্ট সময় অন্তর জাতীয় কাউন্সিল, পার্টি কংগ্রেস বা মজলিসে শুরা আয়োজনের বাধ্যবাধকতা রয়েছে। কিন্তু বাস্তব চর্চায় অধিকাংশ রাজনৈতিক দলের জাতীয় কাউন্সিল নিয়মিতভাবে অনুষ্ঠিত হয় না। নিয়মিত জাতীয় কাউন্সিল অনুষ্ঠিত হলেও তা প্রায়ই পূর্বনির্ধারিত সিদ্ধান্ত অনুমোদনের আনুষ্ঠানিক মঞ্চে পরিণত হয়। বাস্তব চর্চায় রাজনৈতিক দলগুলোতে নীতিনির্ধারণী সম্পর্কিত বিতর্ক, বিকল্প প্রস্তাব উপস্থাপন কিংবা প্রতিনিধিদের স্বাধীন মতামত প্রদানের সুযোগ তুলনামূলকভাবে সীমিত।

চিত্র ৫: রাজনৈতিক দলের কাউন্সিল আয়োজন



স্থায়ী কমিটি, প্রেসিডিয়াম বা কেন্দ্রীয় নীতিনির্ধারণী কমিটিগুলোকে গঠনতন্ত্রে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে চিহ্নিত করা হলেও এসব কমিটির কার্যকারিতা অনেকাংশেই দলীয় শীর্ষ নেতৃত্বের রাজনৈতিক প্রভাবের ওপর নির্ভরশীল। অধিকাংশ গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত আনুষ্ঠানিক বৈঠকের পূর্বেই সীমিত পরিসরে গ্রহণ করা হয় এবং পরবর্তীতে তা সংশ্লিষ্ট কমিটির সভায় অনুমোদিত হয়। এ ধরনের চর্চা সমষ্টিগত নেতৃত্বের পরিবর্তে ব্যক্তিকেন্দ্রিক নেতৃত্বকে শক্তিশালী করে এবং অভ্যন্তরীণ জবাবদিহির প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তিকে দুর্বল করে।

চিত্র ৫-এ দেখা যায় যে, সকল রাজনৈতিক দলের গঠনতন্ত্রে নিয়মিতভাবে জাতীয় সম্মেলন আয়োজন করার বাধ্যবাধকতা থাকলেও ১৬টি দলের নিয়মিত সম্মেলন আয়োজন করে না। এছাড়াও বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল-বিএনপি এক দশকেরও বেশি সময় ধরে জাতীয় সম্মেলন আয়োজন করেনি। ফলে দলের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের জবাবদিহি, সাংগঠনিক পুনর্গঠন এবং নীতিনির্ধারণী সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রাতিষ্ঠানিক প্রক্রিয়া দীর্ঘ সময় ধরে গঠনতাত্ত্বিক নিয়মের ব্যত্যয়ের মাধ্যমে চর্চিত হচ্ছে। এছাড়া, সম্প্রতি নিবন্ধনপ্রাপ্ত কয়েকটি রাজনৈতিক দল নিবন্ধন অর্জনের পরেও কেন্দ্রীয় কাউন্সিল এবং পূর্ণাঙ্গ কেন্দ্রীয় কমিটি গঠন করতে সক্ষম হয়নি।

একইভাবে জেলা, মহানগর, উপজেলা, থানা এবং ওয়ার্ড পর্যায়ের সাংগঠনিক কাঠামোকে গঠনতন্ত্রে দলীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণের অংশ হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হলেও বাস্তবে এসব ইউনিটের কার্যপরিধি প্রধানত কেন্দ্রীয় সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন, নির্বাচনী কার্যক্রম পরিচালনা এবং সাংগঠনিক কর্মসূচি বাস্তবায়নের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। তৃণমূল পর্যায়ে থেকে নীতিগত মতামত বা সাংগঠনিক সুপারিশ কেন্দ্রীয় পর্যায়ে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে প্রতিফলিত হওয়ার সুযোগ সীমিত। ফলে, সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়া নিচ থেকে ওপরে (bottom-up) প্রবাহিত হওয়ার পরিবর্তে উপর থেকে নিচে (top-down) পরিচালিত হয়, যা সদস্যভিত্তিক জবাবদিহি ও অংশগ্রহণমূলক সিদ্ধান্ত গ্রহণকে দুর্বল করেছে। এই বিশ্লেষণ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলোর গঠনতাত্ত্বিক বাধ্যবাধকতা এবং বাস্তব সাংগঠনিক চর্চার মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য ব্যবধান বিদ্যমান। নিয়মিত জাতীয় কাউন্সিল বা সমপর্যায়ের সম্মেলন আয়োজন না হওয়ার ফলে দলীয় গণতন্ত্র, নেতৃত্বের নবায়ন এবং সদস্যদের অংশগ্রহণমূলক সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুযোগ সীমিত হয়ে পড়ে। বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলসমূহে অভ্যন্তরীণ জবাবদিহির প্রধান সংকট আনুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠানের অনুপস্থিতি নয়; বরং বিদ্যমান প্রতিষ্ঠানগুলোর কার্যকর বাস্তবায়নের ঘাটতি। অর্থাৎ, সমস্যা মূলত সাংগঠনিক বা নিয়মতাত্ত্বিকতায় নয়, বরং প্রাতিষ্ঠানিক নিয়ম গঠনতাত্ত্বিক প্রক্রিয়ায় চর্চা না করায়। ফলে দলীয় সুশাসন শক্তিশালী করতে কেবল নতুন সাংগঠনিক বিধান প্রণয়ন যথেষ্ট নয়; বিদ্যমান বিধানের কার্যকর প্রয়োগ, নিয়মিত ও অর্থবহ কাউন্সিল অধিবেশন, সিদ্ধান্ত গ্রহণে তৃণমূলের অংশগ্রহণ এবং নেতৃত্বের প্রতি কার্যকর প্রাতিষ্ঠানিক জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা অপরিহার্য।

দলীয় শৃঙ্খলা ব্যবস্থা

রাজনৈতিক দলের অভ্যন্তরীণ জবাবদিহির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রাতিষ্ঠানিক উপাদান হলো দলীয় শৃঙ্খলা ব্যবস্থা। রাজনৈতিক দলের সাংগঠনিক সংহতি বজায় রাখা, গঠনতন্ত্র ও দলীয় সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন, সদস্যদের আচরণ নিয়ন্ত্রণ এবং দলীয় আদর্শের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ কর্মকাণ্ড নিশ্চিত করার জন্য গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত সকল রাজনৈতিক দল তাদের গঠনতন্ত্রে শৃঙ্খলা-সংক্রান্ত বিধান অন্তর্ভুক্ত করেছে। এসব বিধানের মাধ্যমে কোন ধরনের আচরণ দলীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গ হিসেবে বিবেচিত হবে, কোন কর্তৃপক্ষ শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে এবং কী ধরনের শাস্তি প্রদান করা যেতে পারে-তার একটি আনুষ্ঠানিক কাঠামো নির্ধারণ করা হয়। তবে এসব বিধানের যোগ্যতা ও প্রাসঙ্গিকতার ভিত্তিতে নিরপেক্ষ, ন্যায়সংগত এবং বৈষম্যহীন প্রয়োগই দলের অভ্যন্তরীণ জবাবদিহিতার উপস্থিতি নিশ্চিত করে। পাশাপাশি, দলীয় শৃঙ্খলা ব্যবস্থার ক্ষেত্রে গঠনতন্ত্রে উল্লিখিত বিধানের যথাযথ প্রয়োগ, অভিযোগ নিষ্পত্তির প্রক্রিয়া, তদন্তের ব্যবস্থা, আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ, সিদ্ধান্ত গ্রহণের কর্তৃত্ব, শাস্তির সামঞ্জস্য এবং সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার সুযোগের উল্লেখ থাকা গুরুত্বপূর্ণ।

গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত রাজনৈতিক দলগুলোর গঠনতন্ত্র পর্যালোচনায় দেখা যায়, অধিকাংশ দলের ক্ষেত্রেই দলীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গের জন্য সতর্কীকরণ, কারণ দর্শনোর নোটিশ, সাময়িক বরখাস্ত, দলীয় পদ থেকে অপসারণ, সদস্যপদ হুগিত এবং বহিষ্কারের মতো ব্যবস্থা রাখার বিধান রয়েছে। তবে এসব বিধানের ভাষা, শৃঙ্খলা ভঙ্গের সংজ্ঞা এবং শাস্তির মাত্রা নির্ধারণের মানদণ্ডের মধ্যে দলভেদে পার্থক্য রয়েছে। প্রায় সকল রাজনৈতিক দলের গঠনতন্ত্রে ‘দলীয় স্বার্থবিরোধী কর্মকাণ্ড’, ‘দলীয় সিদ্ধান্ত অমান্য’, ‘দলের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ করা’, ‘দলীয় নীতি ও আদর্শের পরিপন্থী কার্যক্রম’ কিংবা ‘শৃঙ্খলা ভঙ্গ’-এর মতো তুলনামূলকভাবে বিস্তৃত শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। ফলে কোন ধরনের আচরণ কোন মাত্রায় শৃঙ্খলা ভঙ্গ হিসেবে বিবেচিত হবে এবং তার জন্য কোন ধরনের শাস্তি প্রযোজ্য হবে সে বিষয়ে সব ক্ষেত্রে সুস্পষ্টভাবে নির্ধারিত করা হয়নি। অন্যদিকে কোনো দলেরই নেতা-কর্মীদের জন্য স্বতন্ত্র আচরণবিধি নেই।

রাজনৈতিক দলের গঠনতন্ত্রে সদস্যদের শৃঙ্খলাসংক্রান্ত আচরণ, অপরাধের ধরন ও সংশ্লিষ্ট ব্যবস্থা গ্রহণের মানদণ্ড সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা বা ব্যাখ্যার অভাব থাকায় শৃঙ্খলামূলক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে শীর্ষ নেতৃত্বের ব্যক্তিগত বিবেচনার ওপর নির্ভরশীলতার সুযোগ রয়েছে। ফলে দলীয় আনুষ্ঠানিক বিধিবিধানকে পরিস্থিতিভেদে সুবিধাজনকভাবে ব্যাখ্যা বা প্রয়োগ করার সম্ভাবনা থাকে এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও জবাবদিহিতার ক্ষেত্রে অনানুষ্ঠানিক প্রক্রিয়া ও সম্পর্কনির্ভর চর্চার সুযোগ রয়েছে। এই অনানুষ্ঠানিক প্রক্রিয়া চর্চার কারণে একই ধরনের শৃঙ্খলা ভঙ্গের আচরণের ক্ষেত্রে ভিন্ন সদস্যের বিরুদ্ধে ভিন্ন ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। ফলস্বরূপ, দলীয় রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে শৃঙ্খলাভঙ্গ সম্পর্কিত অভ্যন্তরীণ জবাবদিহি দুর্বলভাবে চর্চিত হয় এবং সকল সদস্যের জন্য সমান মানদণ্ড নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা দেখা যায়।

দলীয় শৃঙ্খলা ব্যবস্থার কার্যকারিতা শুধু শাস্তি প্রদানের ক্ষমতার ওপর নির্ভরশীল নয়; বরং অভিযোগ গ্রহণ, তদন্ত, আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়ার ওপরও নির্ভরশীল। রাজনৈতিক দলগুলোর গঠনতন্ত্রে শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য বিভিন্ন কমিটি বা কর্তৃপক্ষের বিধান থাকলেও বাস্তবে গুরুত্বপূর্ণ শৃঙ্খলামূলক সিদ্ধান্ত অনেক ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের ওপর নির্ভর করে। ফলে অভিযোগ গ্রহণ, তদন্তের নির্দেশ, শাস্তির মাত্রা নির্ধারণ এবং চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের মধ্যে প্রাতিষ্ঠানিক পৃথকীকরণ ব্যবস্থা সব ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট নয়। একইভাবে, শাস্তিমূলক সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপিল বা পুনর্বিবেচনার সুযোগ কতটা কার্যকর এবং কোন কর্তৃপক্ষ সেই আবেদন নিষ্পত্তি করতে দায়িত্বপ্রাপ্ত ও বিষয়টিও সুস্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ নয়। কোনো সদস্যকে শাস্তি দেওয়ার ক্ষমতার পাশাপাশি সেই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রতিকার পাওয়ার সুযোগ থাকা প্রক্রিয়াগত জবাবদিহির একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। প্রকাশ্যে দলীয় নোটিশ বা সংবাদ প্রতিবেদনে সাধারণত অভিযোগ এবং গৃহীত সিদ্ধান্তের তথ্য পাওয়া গেলেও তদন্তের পদ্ধতি, প্রমাণ মূল্যায়নের মানদণ্ড, অভিযুক্ত ব্যক্তির বক্তব্য কতটা বিবেচনা করা হয়েছে এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে কোন গঠনতাত্ত্বিক বিধান প্রয়োগ করা হয়েছে এসব বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য সাধারণত প্রকাশ করা হয় না। ফলে শাস্তিমূলক সিদ্ধান্তের ফলাফল তুলনামূলকভাবে দৃশ্যমান হলেও সিদ্ধান্ত গ্রহণের অভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়াটি কম দৃশ্যমান।

দলীয় শৃঙ্খলা ব্যবস্থার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো শাস্তিমূলক সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা এবং প্রত্যাহারের সুযোগ। রাজনৈতিক দলগুলো বিভিন্ন সময়ে শৃঙ্খলাভঙ্গের অভিযোগে নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে বহিষ্কার, পদচ্যুতি কিংবা সদস্যপদ হুগিত করার মতো শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করলেও পরবর্তী সময়ে অনেক ক্ষেত্রে সেই সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করে সংশ্লিষ্ট/অভিযুক্ত ব্যক্তিদের সদস্যপদ বা সাংগঠনিক অবস্থান পুনর্বহাল করে থাকে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে দলীয় নেতৃত্ব পূর্বে শাস্তিপ্রাপ্ত নেতা-কর্মীর সাংগঠনিক গুরুত্ব, রাজনৈতিক প্রভাব কিংবা দলের জন্য তার কৌশলগত প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি পুনর্বিবেচনা করে এ ধরনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকে। আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে রাজনৈতিক পরিস্থিতির পরিবর্তন, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির শাস্তি পরবর্তী আচরণ, দলীয় সিদ্ধান্তের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন বা শৃঙ্খলা কমিটি পুনর্মূল্যায়ন কার্যক্রম পুনর্বহালের পেছনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। অনেকক্ষেত্রে বিভিন্ন অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ না করে গুরুত্বপূর্ণ পদ-পদবী দিয়ে পুরস্কৃত করা হয়। সুতরাং, রাজনৈতিক দলসমূহের দলীয় শৃঙ্খলা ব্যবস্থা সবসময় একমুখী বা অপরিবর্তনীয় নয়; বরং বিশেষ পরিস্থিতিতে শাস্তিমূলক সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার সুযোগ বিদ্যমান রয়েছে। তবে অধিকাংশ রাজনৈতিক দলের গঠনতন্ত্রে শাস্তি প্রত্যাহার বা সদস্যপদ পুনর্বহালের জন্য অনুসরণীয় সুনির্দিষ্ট মানদণ্ড, যোগ্যতা, কর্তৃপক্ষ কিংবা প্রক্রিয়া সম্পর্কে স্পষ্ট নির্দেশনার ঘাটতি রয়েছে। একই ধরনের পরিস্থিতিতে সকল সদস্যের জন্য সমান সুযোগ ও অভিন্ন প্রক্রিয়া প্রযোজ্য হবে কি না, সে বিষয়েও সাধারণত সুস্পষ্ট বিধান অনুপস্থিত। ফলে পুনর্বহালের সিদ্ধান্ত অনেক ক্ষেত্রে আনুষ্ঠানিক ও নিয়মভিত্তিক প্রক্রিয়ার পরিবর্তে নেতৃত্বের বিবেচনামূলক ক্ষমতার ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে।

গবেষণায় আরও দেখা যায় যে, অনেক রাজনৈতিক দলে সদস্য ও কর্মীদের অভিযোগ জানানো বা প্রতিকার চাওয়ার আনুষ্ঠানিক ব্যবস্থা থাকলেও দলীয় নেতা-কর্মীদের কর্মকাণ্ড দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত সাধারণ নাগরিকদের অভিযোগ জানানো ও বিচারপ্রাপ্তির কোনো কার্যকর প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা রাজনৈতিক দলের গঠনতন্ত্রে ও চর্চায় অনুপস্থিত। ফলে রাজনৈতিক দলের নেতা-কর্মীসহ রাজনৈতিক দলের কার্যক্রমের সামাজিক জবাবদিহিতা নিশ্চিত হয় না। অধিকাংশ রাজনৈতিক দলে সুস্পষ্ট আচরণবিধি, কার্যকর নৈতিক মানদণ্ড এবং জবাবদিহিতামূলক শৃঙ্খলা ব্যবস্থা দুর্বল হওয়ায় ক্ষমতাসীন বা ক্ষমতার নিকটবর্তী দলগুলোর নেতা-কর্মীরা বিভিন্ন ধরনের সহিংসতা, হত্যা, দখলবাজি, চাঁদাবাজি, অনিয়ম-দুর্নীতি, জুয়া, মাদক ব্যবসা, সেক্সটরশন ইত্যাদি অনৈতিক ও অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়ে। এর ফলে রাজনৈতিক প্রতিযোগিতা আর্দ্রশিক ও প্রাতিষ্ঠানিক শৃঙ্খলার পরিবর্তে দলীয় কর্তৃত্বের ব্যবহার অনানুষ্ঠানিক উপায়ে ব্যবহৃত হয়ে সমাজে দলীয় প্রভাব বিস্তার করে।

রাজনৈতিক দলসমূহের অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা রক্ষা ও বিরোধ ব্যবস্থাপনার জন্য কার্যকর ও সুস্পষ্ট প্রাতিষ্ঠানিক দুর্বলতার কারণে বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিসরে রাজনৈতিক সহিংসতা স্বাভাবিকরণ হয়ে উঠেছে। গবেষণায় পর্যালোচিত উপাত্ত অনুযায়ী, ২০১৩ থেকে ২০২৬ সালের আগস্ট পর্যন্ত বিভিন্ন রাজনৈতিক দলে মোট ২,৩৫৪টি অভ্যন্তরীণ সংঘর্ষের ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। রাজনৈতিক দলের এই অভ্যন্তরীণ সংঘর্ষের কারণে গত তেরো বছর আট মাসে ২৭,৮৬০ জন আহত এবং ৪২৮ জন নিহত হয়েছেন। রাজনৈতিক সহিংসতার ঘটনা বছরই অনুযায়ী বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, প্রায় প্রতি বছরই দলীয় অভ্যন্তরীণ বিরোধকে কেন্দ্র করে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক হতাহতের ঘটনা ঘটেছে। রাজনৈতিক দলের অভ্যন্তরীণ সংঘাতের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, ২০২৫ সালে সংঘর্ষের ঘটনা, আহত ও নিহতের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। রাজনৈতি সংঘাতে এই চিত্র মূলত অভ্যন্তরীণ দলীয় প্রতিযোগিতা ও ক্ষমতার লড়াই দলীয় শৃঙ্খলা এবং সাংগঠনিক কাঠামোর বিদ্যমান প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কার্যকরভাবে নিয়ন্ত্রণ বা নিষ্পত্তি করা সম্ভব হয়নি। ফলে অনেক ক্ষেত্রে অভ্যন্তরীণ বিরোধ সংঘাতপূর্ণ রূপ ধারণ করেছে এবং তা সহিংসতার মাধ্যমে প্রকাশ পেয়েছে।

রাজনৈতিক সংঘাতের এই ধারাবাহিকতা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, রাজনৈতিক দলসমূহে অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা ব্যবস্থাপনা, বিশেষত অভ্যন্তরীণ বিরোধ নিষ্পত্তি এবং সাংগঠনিক কাঠামোর জবাবদিহি নিশ্চিতকরণে বিদ্যমান প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা ও চর্চা দুর্বল। ফলে অভ্যন্তরীণ মতবিরোধ ও ক্ষমতার প্রতিযোগিতা প্রাতিষ্ঠানিক প্রক্রিয়া নিরসনের পরিবর্তে সংঘাত ও সহিংসতার মাধ্যমে প্রকাশিত হয়ে থাকে। এর ফলফল হিসেবে দেখা যায় যে, সংঘর্ষ, আহত ও নিহতের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে ২০২৫ সালে। রাজনৈতিক সংঘাতের এই পরিস্থিতি প্রকাশ করে যে, রাজনৈতিক দলসমূহে বিরোধ নিষ্পত্তি, নেতৃত্ব নির্বাচন এবং সাংগঠনিক শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য কার্যকর প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা পর্যাণ্ডভাবে বিকশিত হয়নি।

সারণি ১৬: রাজনৈতিক দলগুলোর অভ্যন্তরীণ সহিংসতার চিত্র

গাল	সংঘর্ষের ঘটনা	আহত	নিহত
২০১৩	২৬১	৩২২০	৩৩
২০১৪	১৯৭	২৫৩৬	৩৯
২০১৫	২৩৫	২৪৬২	৩৩
২০১৬	১৩২	১৩৪৪	২২
২০১৭	২৪২	৩১৭১	৪০
২০১৮	১৪৬	১৯৭৮	৩১
২০১৯	১০২	১৪৬১	১৪
২০২০	৯৪	১১০১	২৫
২০২১	১০৪	১২৬১	১৪
২০২২	১৩১	১৬৯৯	১৬
২০২৩	১০৭	১০৭০	১৫
২০২৪	১৯৭	২৩১৯	৪৫
২০২৫	২৮৬	৩১৭৫	৭৭
২০২৬	১২০	১০৬৩	২৪
মোট	২৩৫৪	২৭৮৬০	৪২৮

তথ্যসূত্র: আইন ও সালিশ কেন্দ্র এর বিভিন্ন প্রতিবেদন থেকে প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ

অন্যদিকে রাজনৈতিক দলগুলোর আন্তঃদলীয় সহিংসতার পরিসংখ্যান বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, ২০১৩-২০২৬ (আগস্ট পর্যন্ত) সময়ে মোট ১,৯২৬টি সংঘর্ষের ঘটনায় ১৮,৪৯১ জন আহত এবং ৩১৮ জন নিহত হয়েছেন। এ সময়কালে সংঘর্ষের মাত্রা বছরভেদে উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস-বৃদ্ধি করলেও বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ঘটনা প্রবাহে ক্ষমতার পুনর্বিন্যাসের সময়ে সহিংসতার প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে। বিশেষভাবে ২০১৫ সালে সর্বোচ্চ ৫০২টি সংঘর্ষ, ২,৩৭৮ জন আহত এবং ১০৯ জন নিহত হওয়ার ঘটনা সংঘর্ষিক রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা প্রকাশ করে। একইভাবে ২০২৪ সালে সরকার পতন পরবর্তী রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে ২৭০টি সংঘর্ষ, ২,৩৫২ জন আহত এবং ৩৮ জন নিহত হয়েছে।

সারণি ১৭: রাজনৈতিক দলগুলোর আন্তঃদলীয় সহিংসতার চিত্র

বছর	সংঘর্ষের ঘটনা	আহত	নিহত
২০১৩	২৩৪	৩২৯২	৬৩
২০১৪	২১৫	১৮১৫	৪৪
২০১৫	৫০২	২৩৭৮	১০৯
২০১৬	২৫	২৫৫	৪
২০১৭	৩৭	৪৭৬	৩
২০১৮	২৫	২৪০	১

বছর	সংঘর্ষের ঘটনা	আহত	নিহত
২০১৯	৭	৭৬	০
২০২০	১২	১৬২	১
২০২১	৩১	৫৬৭	৬
২০২২	১১৮	১৯৯৩	৩
২০২৩	৯৩	১৩৮৮	১
২০২৪	২৭০	২৩৫২	৩৮
২০২৫	১০৯	১৫০১	২৫
২০২৬ (আগস্ট পর্যন্ত)	২৪৮	১৯৯৬	২০
মোট	১৯২৬	১৮৪৯১	৩১৮

তথ্যসূত্র: আইন ও সালিশি কেন্দ্র এর বিভিন্ন প্রতিবেদন থেকে প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ

অন্তঃদলীয় রাজনৈতিক সংঘাতের তীব্রতা প্রকাশ পায় ২০২৬ সালের আগস্ট পর্যন্ত মাত্র আট মাসেই ২৪৮টি সংঘর্ষ, ১,৯৯৬ জন আহত এবং ২০ জন নিহত হওয়ার ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। অধিকাংশ রাজনৈতিক সহিংসতায় মূলত বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ও বিএনপির সম্পৃক্ততা লক্ষ করা যায়। তবে কিছু ক্ষেত্রে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী, জাতীয় পার্টি, এনসিপির সম্পৃক্ততা রয়েছে। এই রাজনৈতিক সহিংসতা রাজনৈতিক দলগুলোর অভ্যন্তরীণ ও আন্তঃগোষ্ঠীগত প্রতিযোগিতার তীব্রতার ইঙ্গিত বহন করে (আইন ও সালিশি কেন্দ্র, ২০২৬)। এই প্রবণতা নির্দেশ করে যে, রাজনৈতিক দলগুলো বিরোধ ও ক্ষমতার দ্বন্দ্বকে কার্যকর সাংগঠনিক ও প্রাতিষ্ঠানিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নিষ্পত্তি করতে পর্যাপ্তভাবে সক্ষম হয়নি। ফলে রাজনৈতিক প্রতিযোগিতা অনেক ক্ষেত্রে সহিংসতা ও সংঘর্ষের মাধ্যমে প্রকাশ পাচ্ছে, যা দলীয় শৃঙ্খলা, অভ্যন্তরীণ জবাবদিহি এবং গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক চর্চার দুর্বলতাকেই প্রতিফলিত করে। রাজনৈতিক সহিংসতার অধিকাংশ ঘটনায় আওয়ামী লীগ ও বিএনপি প্রধান পক্ষ হিসেবে আবির্ভূত হলেও, জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ, জাতীয় পার্টি এবং এনসিপিসহ অন্যান্য রাজনৈতিক দলের সীমিত পরিসরে সম্পৃক্ততা রয়েছে। রাজনৈতিক সংঘাতের এক দশকেরও বেশি সময়ের এই পরিসংখ্যানভিত্তিক চিত্র রাজনৈতিক দলগুলোর অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা, জবাবদিহিতা ও সংঘাত নিরসনে সক্ষমতার ঘাটতির পাশাপাশি দেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে সহিংসতাকে স্থায়িত্ব ও স্বাভাবিককরণ করেছে।

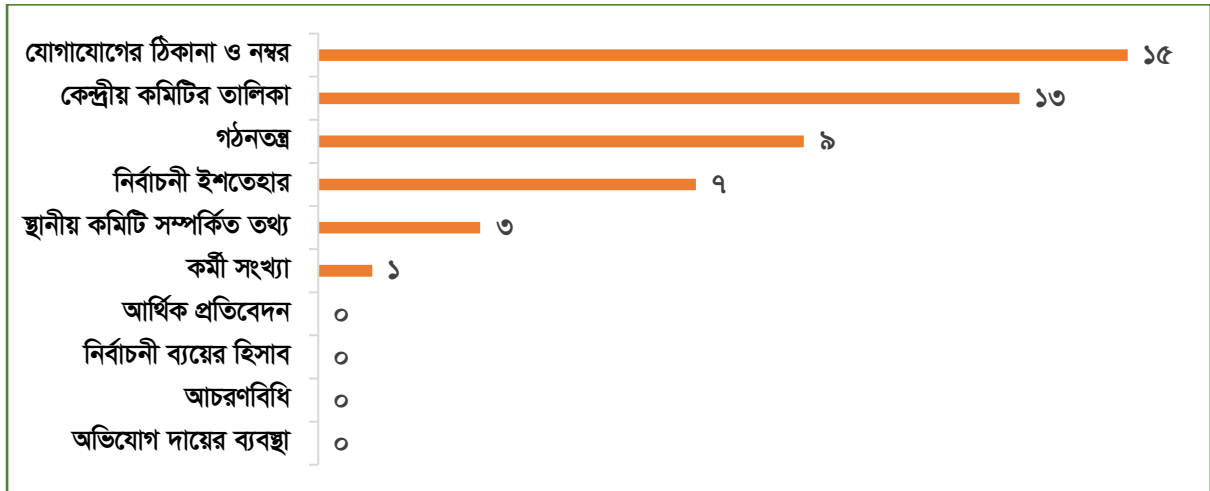
গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে বলা যায় যে, বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলোর আনুষ্ঠানিক জবাবদিহি ব্যবস্থার অংশ হিসেবে দলীয় শাস্তিমূলক বিধান, শৃঙ্খলা রক্ষাকারী কর্তৃপক্ষ এবং সাংগঠনিক ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন কাঠামো গঠনতন্ত্রে বিদ্যমান রয়েছে। শৃঙ্খলা রক্ষায় গঠনতান্ত্রিক উপায়ে দলীয় শৃঙ্খলা সংক্রান্ত কর্মকাণ্ডে বহিষ্কার, কারণ দর্শানো, তদন্ত, সাময়িক স্থগিতাদেশ এবং পুনর্বহাল ব্যবস্থা উল্লেখ রয়েছে। তবে গবেষণায় চিহ্নিত গুরুত্বপূর্ণ সীমাবদ্ধতার মধ্যে রয়েছে শৃঙ্খলা ভঙ্গের মানদণ্ডের অস্পষ্টতা, একই ধরনের আচরণের ক্ষেত্রে সম্ভাব্য ভিন্ন শাস্তি, শাস্তিমূলক সিদ্ধান্ত গ্রহণে ক্ষমতার কেন্দ্রীভবন, অভিযোগ ও শুনানি প্রক্রিয়ার সীমিত স্বচ্ছতা এবং দলীয় শৃঙ্খলা ব্যবস্থার মাধ্যমে ভিন্নমত নিয়ন্ত্রণের ঝুঁকি। পাশাপাশি, অন্তঃদলীয় এবং অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক সংঘাত নিরসনে রাজনৈতিক দলগুলো বিশেষ করে ক্ষমতাসীন বা ক্ষমতার আহরণ করার সম্ভাব্য রাজনৈতিক দলগুলো দীর্ঘ সময় ধরে পর্যাপ্ত সক্ষমতা অর্জন করতে পারেনি।

তথ্য প্রকাশ

রাজনৈতিক দলের প্রাতিষ্ঠানিক স্বচ্ছতা ও তথ্য প্রকাশে ঘাটতি

রাজনৈতিক দলের প্রাতিষ্ঠানিক পরিচালনায় সুশাসন নিশ্চিত জনগণ ও অংশীজনদের কাছে দলের কার্যক্রম ও আর্থিক তথ্য স্বপ্রণোদিতভাবে উন্মুক্ত রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তবে বাংলাদেশে নিবন্ধিত ও সক্রিয় রাজনৈতিক দলগুলোর ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম ও ওয়েবসাইটে তথ্য প্রকাশের চিত্র পর্যালোচনা করলে ব্যাপক স্বচ্ছতার ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়। গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত ৩২টি রাজনৈতিক দলের মধ্যে ২৪টি দলের ওয়েবসাইট থাকলেও প্রকৃতপক্ষে মাত্র ১৬টি দলের ওয়েবসাইট সক্রিয় রয়েছে, অর্থাৎ অবশিষ্ট দলগুলোর স্বচ্ছতা নিশ্চিত বা স্বপ্রণোদিতভাবে তথ্য প্রকাশের জন্য কার্যকর ডিজিটাল উপস্থিতি সীমিত। এমনকি যেসব দলের ওয়েবসাইট সক্রিয় রয়েছে, সেগুলোর ক্ষেত্রেও স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশের ক্ষেত্রে ব্যাপক ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়।

চিত্র ৬: রাজনৈতিক দলের ওয়েবসাইটে তথ্য প্রকাশ করা দলের সংখ্যা



গবেষণায় আওতাভুক্ত সক্রিয় থাকা ১৬টি রাজনৈতিক দলের ওয়েবসাইটে বিশ্লেষণ করলে তথ্যের প্রকারভেদ অনুযায়ী স্বচ্ছতার চিত্র স্পষ্ট হয়ে ওঠে। মৌলিক প্রাতিষ্ঠানিক তথ্যের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ১৫টি দল যোগাযোগের ঠিকানা ও নম্বর প্রকাশ করেছে এবং ১৩টি দল কেন্দ্রীয় কমিটির তালিকা ওয়েবসাইটে অন্তর্ভুক্ত করেছে। তবে রাজনৈতিক আদর্শ ও নীতির ক্ষেত্রে দলের মূল দলিল বা গঠনতন্ত্র প্রকাশ করেছে মাত্র ৯টি দল এবং নির্বাচনী ইশতেহার উন্মুক্ত রেখেছে ৭টি দল। মাঠপর্যায়ের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা আরও সংকুচিত; স্থানীয় কমিটি সম্পর্কিত তথ্য রয়েছে মাত্র ৩টি দলের এবং মাত্র ১টি দল তাদের কর্মীদের সংখ্যার হিসাব ওয়েবসাইটে উল্লেখ করেছে। রাজনৈতিক দলের আর্থিক ব্যবস্থাপনা, আচরণবিধি এবং জবাবদিহি সংক্রান্ত সংবেদনশীল তথ্য প্রকাশের ক্ষেত্রে দলগুলোর অনগ্রহ লক্ষ করা গেছে। গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত কোনো রাজনৈতিক দলই তাদের নিরীক্ষিত বার্ষিক আর্থিক প্রতিবেদন, নির্বাচনী ব্যয়ের হিসাব, দলের অভ্যন্তরীণ আচরণবিধি কিংবা দলের নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়েরের আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা সম্পর্কিত তথ্য তাদের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করে না।

আরপিও, ১৯৭২ এর ধারা ৪৪গগ(১)-এ বলা হয়েছে-

“নির্বাচনের জন্য প্রার্থী মনোনয়নকারী প্রত্যেক রাজনৈতিক দল অনুচ্ছেদ ১১ এর দফা (১) এর অধীন প্রজ্ঞাপন প্রকাশিত হইবার তারিখ হইতে যে সকল নির্বাচনী এলাকায় উহার প্রার্থীগণ প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতেছেন, সেই সকল এলাকায় নির্বাচন সমাপ্ত হওয়া পর্যন্ত সময়ের জন্য উহার সকল আয় ও ব্যয়ের যথাযথ হিসাব রক্ষণ করিবে এবং এইরূপ হিসাবে কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী বা কোনো মনোনয়ন প্রত্যাশী, বা অন্য কোনো ব্যক্তির নিকট হইতে দান হিসাবে প্রাপ্ত পাঁচ হাজার টাকার অধিক পরিমাণ অর্থ, তাহাদের নাম-ঠিকানা এবং প্রত্যেকের নিকট হইতে প্রাপ্ত অর্থ এবং প্রাপ্তির ধরন উল্লেখ করিয়া সুস্পষ্টভাবে প্রদর্শন করিতে হইবে এবং রাজনৈতিক দল দান হিসাবে প্রাপ্ত অর্থের বিস্তারিত তালিকা স্বচ্ছতার সহিত উহাদের দলের অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে প্রদর্শন করিবে”।

নির্বাচনে দলীয় প্রার্থী মনোনয়নকারী প্রত্যেক রাজনৈতিক দলের নির্বাচনকালীন আয়-ব্যয়ের হিসাব সংশ্লিষ্ট দলের ওয়েবসাইটে প্রকাশের বাধ্যবাধকতা থাকলেও গবেষণায় কোনো দল সংশ্লিষ্ট আয়-ব্যয়ের হিসাব ওয়েবসাইটে প্রকাশ করে না।

এছাড়াও, রাজনৈতিক দলগুলোর দলভিত্তিক প্রাতিষ্ঠানিক উন্মুক্ততা ও ডিজিটাল স্বচ্ছতার চর্চা মূল্যায়ন করলে প্রতিটি দলের মধ্যে তথ্য প্রকাশের ক্ষেত্রে ব্যাপক পার্থক্য দেখা যায়। গবেষণায় আওতাভুক্ত সক্রিয় থাকা ১৬টি রাজনৈতিক দলের ওয়েবসাইটে পর্যালোচনায় দেখা যায়, ১৬টি দলের মধ্যে পাঁচটি দল সর্বাধিক চার ধরনের তথ্য প্রকাশ করেছে; আটটি দল তিনটি বিষয়ে তথ্য প্রকাশ করেছে; একটি দল দুইটি বিষয়ে তথ্য প্রকাশ করেছে। অপরদিকে, দুইটি দল শুধুমাত্র দলের যোগাযোগের ঠিকানা ও নম্বর ব্যতীত বিশেষ কোনো তথ্য দলের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করেনি।

সারণি ১৮: রাজনৈতিক দলের ওয়েবসাইটে সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশ

ক্রম	রাজনৈতিক দলের নাম	প্রকাশিত তথ্যের সংখ্যা	যোগাযোগের ঠিকানা ও নম্বর	কেন্দ্রীয় কমিটির তালিকা	গঠনতন্ত্র	নির্বাচনী ইশতেহার	স্থানীয় কমিটি সম্পর্কিত তথ্য	কর্মী সংখ্যা	আর্থিক প্রতিবেদন	নির্বাচনী ব্যয়ের হিসাব	আচরণবিধি	অভিযোগ দায়ের ব্যবস্থা
১	লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টি	৪		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
২	বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস	৪		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
৩	বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী	৪		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
৪	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল-বি.এন.পি	৪		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
৫	জাতীয় পার্টি	৪		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
৬	বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি	৩		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
৭	বাংলাদেশের বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টি	৩		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
৮	গণসংহতি আন্দোলন	৩		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
৯	আমার বাংলাদেশ পার্টি (এবি পার্টি)	৩		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
১০	জাতীয় গণতান্ত্রিক পার্টি	৩		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
১১	জাতীয় নাগরিক পার্টি-এনসিপি	৩		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
১২	খেলাফত মজলিস	৩		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
১৩	বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টি	৩		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
১৪	জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক আন্দোলন-এনডিএম	৩		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
১৫	বাংলাদেশ কল্যাণ পার্টি	৩		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
১৬	বাংলাদেশ মাইনরিটি জনতা পার্টি (বিএমজেপি)	৩		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

আর্থিক হিসাব ও প্রাতিষ্ঠানিক অভিযোগ নিষ্পত্তির মতো অতিগুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রগুলোকে সম্পূর্ণ গোপনীয় রাখার এই চর্চা প্রমাণ করে যে, বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলো আইনি নিবন্ধনের স্বকীয় শর্ত পূরণ করলেও প্রাতিষ্ঠানিক স্বচ্ছতা, আর্থিক জবাবদিহিতা ও আধুনিক গণতান্ত্রিক সুশাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে অনেক পিছিয়ে রয়েছে।

রাজনৈতিক দলের আর্থিক ব্যবস্থাপনা

গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় রাজনৈতিক দলসমূহের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য রাজনৈতিক দলগুলোর নিয়মিত আর্থিক সম্পদের প্রয়োজন হয়। ফলে রাজনৈতিক দলের আর্থিক ব্যবস্থাপনা, অর্থায়নের উৎস, ব্যয় পরিচালনা এবং আর্থিক জবাবদিহি রাজনৈতিক দলের অভ্যন্তরীণ সুশাসনের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে বিবেচিত হয়। রাজনৈতিক অর্থায়ন (Political Finance) গণতন্ত্রের জন্য একদিকে অপরিহার্য, অন্যদিকে সম্ভাব্য ঝুঁকিপূর্ণ। একদিকে রাজনৈতিক সংগঠন পরিচালনা, জনসম্পৃক্ততা এবং প্রার্থী মনোনয়নসহ জনগণের কাছে রাজনৈতিক বার্তা পৌঁছে দেওয়ার জন্য অর্থের প্রয়োজন হয়। অন্যদিকে অর্থের উৎস ও ব্যবহারে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহির অভাব থাকলে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া ব্যাহত হয় এবং রাজনৈতিক অর্থায়ন কার্যক্রমে দুর্নীতি, পৃষ্ঠপোষকতামূলক রাজনীতি (Patron-Client Politics), প্রভাবশালী গোষ্ঠীর আধিপত্য এবং অসম রাজনৈতিক প্রতিযোগিতার উৎসে রূপান্তরিত হয় (নাসম্যাখার, ২০০৯; আইডিইএ, ২০১৪)। রাজনৈতিক দলের কার্যক্রমে সুশাসনের আলোচনায় আর্থিক ব্যবস্থাপনা কেবল হিসাবরক্ষণ বা অর্থ সংগ্রহের বিষয় নয়; বরং এটি দলীয় স্বচ্ছতা, জবাবদিহি, প্রতিষ্ঠানিকীকরণ এবং অভ্যন্তরীণ গণতন্ত্রের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। সুসংগঠিত রাজনৈতিক দলগুলো সাধারণত আনুষ্ঠানিক আর্থিক নীতিমালা, বাজেট ব্যবস্থা, অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা এবং স্বচ্ছ আর্থিক প্রতিবেদন পদ্ধতির মাধ্যমে পরিচালিত হয় (Mainwaring & Scully, ১৯৯৫; Randall & Svåsand, ২০০২)।

বাংলাদেশে রাজনৈতিক দলের আর্থিক ব্যবস্থাপনা মূলত গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এবং রাজনৈতিক দল নিবন্ধন বিধিমালা, ২০০৮-এর মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত হয়। এই আইনি কাঠামো ব্যবস্থা রাজনৈতিক দলগুলোর আর্থিক প্রতিবেদন, নিরীক্ষা, অনুদান দাতার পরিচয় প্রকাশ, নির্বাচনী ব্যয় এবং দলীয় নিবন্ধন সংক্রান্ত বিধান নির্ধারণ করে।

দলীয় আর্থিক নীতি ও কার্যপ্রণালী বিধি

গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে কোনো দলেরই পূর্ণাঙ্গ ও স্বতন্ত্র আর্থিক নীতিমালা (Financial Policy) বা আর্থিক কার্যপ্রণালী নেই। অধিকাংশ দলের গঠনতন্ত্রে কেবল আয় ও ব্যয়ের উৎসের সংক্ষিপ্ত উল্লেখ থাকলেও অর্থ সংগ্রহ, ব্যয় অনুমোদন, তহবিল ব্যবস্থাপনা, অভ্যন্তরীণ আর্থিক নিয়ন্ত্রণ এবং জবাবদিহি কাঠামো সম্পর্কে বিশদভাবে উল্লেখ নেই। বিশেষকরে, দলীয় চাঁদা নির্ধারণের পদ্ধতি, অনুদান গ্রহণের শর্ত, সদস্যপদ ফি আদায়ের নিয়ম, আর্থিক লেনদেনের অনুমোদন ব্যবস্থা, হিসাব সংরক্ষণ, বার্ষিক আর্থিক প্রতিবেদন প্রস্তুত এবং নিরীক্ষা প্রক্রিয়া বিষয়ে অধিকাংশ দলের গঠনতন্ত্রে অস্পষ্টতা রয়েছে। ফলে অর্থ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিক মানদণ্ডের পরিবর্তে পরিস্থিতিনির্ভর ও ব্যক্তি-নির্ভর সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুযোগ রয়েছে। রাজনৈতিক দলগুলোর আর্থিক ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত লিখিত নীতিমালা অনুপস্থিতির কারণে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা এবং আর্থিক জবাবদিহি প্রতিষ্ঠা করা কঠিন।

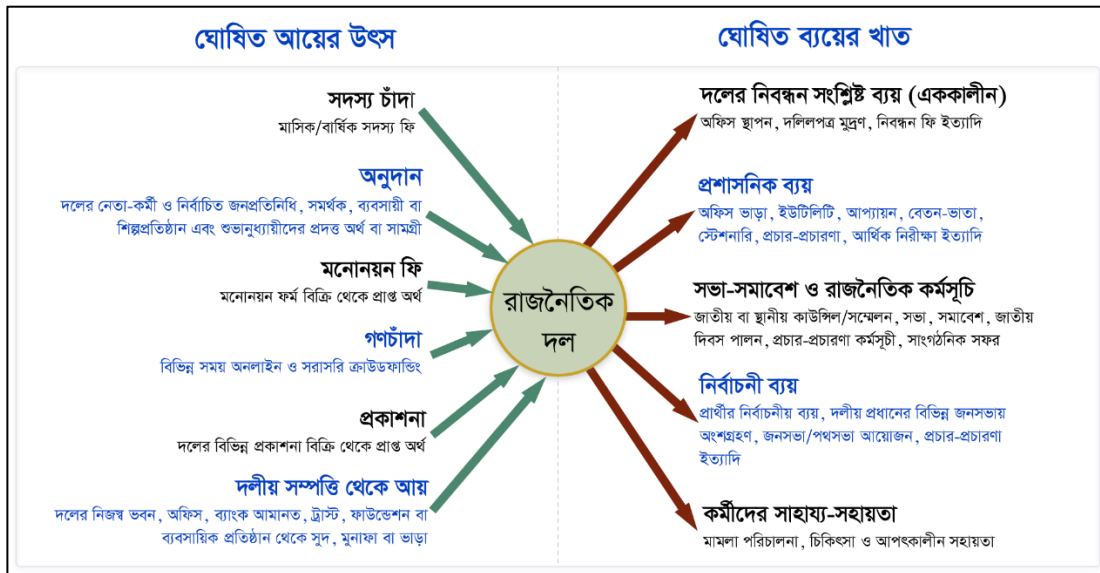
রাজনৈতিক দলগুলো নিজেদের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য নিয়মিত বার্ষিক বাজেট প্রণয়ন করে না এবং তাদের গঠনতন্ত্রে বাজেট প্রণয়ন সংক্রান্ত কোনো ধারা অন্তর্ভুক্ত করেনি। প্রায় সকল দল আয় ও ব্যয়ের পরিকল্পনা দীর্ঘমেয়াদি আর্থিক কৌশল বা পূর্বনির্ধারিত বাজেটের পরিবর্তে দলীয় সভা, সম্মেলন, কর্মসূচি, আন্দোলন বা নির্বাচনী কর্মকাণ্ডকে কেন্দ্র করে তাৎক্ষণিক প্রয়োজন অনুযায়ী অর্থ

সংগ্রহ ও ব্যয়ে করে থাকে। ফলে আর্থিক পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা নিয়মতান্ত্রিক এবং ধারাবাহিক প্রশাসনিক কর্মকাণ্ড হিসেবে গড়ে ওঠার পরিবর্তে কর্মসূচিভিত্তিক ব্যবস্থাপনায় সীমাবদ্ধ রয়েছে।

আয়ের ঘোষিত উৎস ও ব্যয়ের খাত

রাজনৈতিক দলগুলোর আয়ের প্রধান ঘোষিত উৎস হলো সদস্য চাঁদা, অনুদান এবং বিভিন্ন সাংগঠনিক কার্যক্রম থেকে প্রাপ্ত অর্থ। অধিকাংশ দলের গঠনতন্ত্রে সদস্যদের মাসিক বা বার্ষিক চাঁদা প্রদানের বিধান রয়েছে। তবে চাঁদা সংগ্রহের পদ্ধতি, হিসাব সংরক্ষণ এবং তদারকি ব্যবস্থার বিষয়ে বিস্তারিত নির্দেশনার উল্লেখ নেই। তবে দলগুলোর গুরুত্বপূর্ণ আয়ের উৎস হলো দলীয় নেতা-কর্মী, সমর্থক, নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি, ব্যবসায়ী বা শুভানুধ্যায়ীদের অনুদান। রাজনৈতিক দলগুলোর গঠনতন্ত্রে অনুদান সংগ্রহের বিষয়টি উল্লেখ থাকলেও অনুদানের উৎস, গ্রহণযোগ্যতার মানদণ্ড, সীমা বা স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণের বিধান স্পষ্টভাবে নির্ধারিত নয়। ফলে দলীয় অর্থায়নের একটি বড় অংশ অনানুষ্ঠানিক ও ব্যক্তি-নির্ভর উৎসের ওপর নির্ভরশীল থাকে। এয়াড়া রাজনৈতিক দলগুলো জাতীয় ও স্থানীয় নির্বাচনের সময় দলের মনোনয়নপত্র বিক্রির মাধ্যমে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অর্থ সংগ্রহ করে থাকে। এর পাশাপাশি দলগুলো গণচাঁদা বা ক্রাউডফান্ডিং, প্রকাশনা বিক্রয় এবং দলীয় সম্পত্তি বা বিনিয়োগ থেকে আয়ের মাধ্যমে দলীয় তহবিল গঠন করে। দলীয় ভবন, অফিস, ট্রাস্ট, ফাউন্ডেশন কিংবা অন্যান্য সম্পদ থেকে ভাড়া, মুনাফা বা সুদের মাধ্যমে আয় করার সুযোগও কয়েকটি দলের গঠনতন্ত্রে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। তবে সামগ্রিকভাবে, দলগুলোর আয়ের উৎস মূলত সদস্য চাঁদা ও অনুদাননির্ভর এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দীর্ঘমেয়াদি ও প্রাতিষ্ঠানিক অর্থায়ন কৌশল অনুপস্থিত।

চিত্র ৭: আয়ের ঘোষিত উৎস ও ব্যয়ের খাত



রাজনৈতিক দলগুলোর ব্যয় প্রধানত সাংগঠনিক ও রাজনৈতিক কার্যক্রম পরিচালনাকে কেন্দ্র করে সংঘটিত হয়। দলীয় ব্যয়ের মধ্যে প্রশাসনিক ব্যয় বিশেষ করে দলীয় কার্যালয়ের ভাড়া, ইউটিলিটি বিল, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন-ভাতা, স্টেশনারি, যোগাযোগ ব্যয়, প্রকাশনা এবং নিরীক্ষা-সংক্রান্ত ব্যয় অন্তর্ভুক্ত। এছাড়া জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ের সভা, সম্মেলন, কাউন্সিল, জনসভা, রাজনৈতিক সমাবেশ, প্রচার-প্রচারণা এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক দিবস পালনের জন্য উল্লেখযোগ্য অর্থ ব্যয় করা হয়। রাজনৈতিক দলের সাংগঠনিক শক্তি প্রদর্শন এবং সমর্থকগোষ্ঠীর সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষার জন্য এসব ব্যয় নিয়মিতভাবে প্রয়োজন হয়। রাজনৈতিক দলগুলোর জন্য ব্যয়ের একটি বড় ক্ষেত্র হচ্ছে নির্বাচনীকালীন ব্যয়। প্রার্থী মনোনয়ন প্রক্রিয়া, নির্বাচনী প্রচারণা, জনসংযোগ কার্যক্রম, নির্বাচনী সভা, প্রচারসামগ্রী প্রস্তুত এবং বিভিন্ন সাংগঠনিক সময়সীমা কার্যক্রমের জন্য উল্লেখযোগ্য অর্থ ব্যয় করা হয়। যদিও অধিকাংশ দলের গঠনতন্ত্রে নির্বাচনকালীন ব্যয়ের বিষয়ে বিস্তারিত বিধান নেই। এর পাশাপাশি দলীয় কর্মীদের আইনি সহায়তা, চিকিৎসা সহায়তা, জরুরি সহায়তা এবং কল্যাণমূলক কর্মসূচির জন্যও অর্থ ব্যয়ে করে থাকে। তবে এসব ব্যয়ের পরিমাণ ও ব্যবস্থাপনা করার ক্ষেত্রে কোন ধরনের মানদণ্ড ব্যবহার করা হয় সে বিষয়ে গঠনতন্ত্রে উল্লেখ নেই।

হিসাব সংরক্ষণ ও আর্থিক প্রতিবেদন প্রণয়ন

রাজনৈতিক দলের আর্থিক স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করার জন্য নিয়মিত হিসাব সংরক্ষণ, নিরীক্ষা পরিচালনা এবং আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ একটি অপরিহার্য প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রম। বাংলাদেশের সকল নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলের জন্য নির্বাচন কমিশনের নিকট প্রতিবছর দলের আয়-ব্যয়ের হিসাব ও নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন জমা দেওয়া বাধ্যতামূলক হলেও সকল দল এই বিধান নিয়মিতভাবে অনুসরণ করে না। রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে কিছু দল ন্যূনতম আইনগত বাধ্যবাধকতা পালন করেছে এবং একটি বড় অংশ আর্থিক প্রতিবেদন দাখিলের ক্ষেত্রেও অনিয়ম প্রদর্শন করেছে।

নির্বাচন কমিশনে জমা দেওয়া রাজনৈতিক দলগুলোর আর্থিক প্রতিবেদনগুলো সাধারণ জনগণের জন্য উন্মুক্ত নয়। কোনো রাজনৈতিক দল নিজেদের আর্থিক প্রতিবেদন স্বতঃপ্রণোদিতভাবে প্রকাশ করে না এবং নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকেও প্রতিবেদনগুলো নিয়মিতভাবে জনসমক্ষে প্রকাশ করা হয় না। ফলে দলগুলোর অর্থায়নের প্রকৃত উৎস, ব্যয়ের ধরণ এবং আর্থিক সক্ষমতা সম্পর্কে জনসাধারণের অবগত হওয়ার সুযোগ সীমিত। রাজনৈতিক দলগুলোর আর্থিক কর্মকাণ্ডের তথ্য সীমিত পরিসরে আবদ্ধ থাকায় কার্যকর সামাজিক ও প্রাতিষ্ঠানিক পর্যবেক্ষণ নিশ্চিত হওয়া সুযোগ নেই।

বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রকাশিত চারটি রাজনৈতিক দলের আর্থিক হিসাব বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, ২০২৫ সালে চারটি দলের সর্বনিম্ন আয় ১ কোটি ৮২ লাখ থেকে সর্বোচ্চ ২৩ কোটি ৬৮ লাখ টাকা এবং সর্বনিম্ন ব্যয় প্রায় ১ কোটি ৮৭ লাখ টাকা থেকে সর্বোচ্চ ২৩ কোটি ৯১ লাখ টাকা। যদিও দলগুলোর গণমাধ্যমে প্রকাশিত আয়-ব্যয় দলগুলোর রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড, জাতীয় পর্যায়ের কর্মসূচি, সাংগঠনিক বিস্তার এবং নির্বাচন সম্পর্কিত ব্যয়ে বিবেচনা করলে প্রকৃত আয় ও ব্যয়ের তুলনায় অতি নগন্য।

রাজনৈতিক দলসমূহের আর্থিক প্রতিবেদন প্রণয়নে অনিয়ম

আর্থিক ব্যবস্থাপনা যথাযথ আইন ও গঠনতান্ত্রিক পদ্ধতি অনুসরণ করা রাজনৈতিক দলগুলোর অভ্যন্তরীণ জবাবদিহিসহ স্বচ্ছতা নিশ্চিতের গুরুত্বপূর্ণ কাঠামো। আইন অনুযায়ী প্রতিটি নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলের আয়-ব্যয়ের হিসাব স্বাধীন নিরীক্ষকের মাধ্যমে নিরীক্ষা করে বার্ষিক নিরীক্ষা প্রতিবেদন নির্বাচন কমিশনে দাখিল করার বাধ্যবাধকতা রয়েছে। তবে, রাজনৈতিক দলগুলো আইনের এই বাধ্যবাধকতা অনুসরণ করলেও কেবল আনুষ্ঠানিকতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। বাস্তবে দলগুলোর প্রকৃত আর্থিক লেনদেন, আয়-ব্যয়ের উৎস কিংবা ব্যয়ের প্রকৃত পরিমাণ নিরীক্ষা প্রতিবেদনে প্রতিফলিত হয় না; বরং অর্থেও বিনিময়ে নামমাত্র বা মনগড়া আর্থিক বিবরণী প্রস্তুত করে নির্বাচন কমিশনে দাখিল করা হয়। রাজনৈতিক দলগুলো বিশেষ করে সাংগঠনিকভাবে নতুন বা ছোট রাজনৈতিক দলগুলো অনেক ক্ষেত্রে নিরীক্ষা প্রতিবেদন জমাদানের ক্ষেত্রে সাধারণত ২০ থেকে ২৫ হাজার টাকার বিনিময়ে প্রতিবেদন তৈরি করে থাকে। ফলে রাজনৈতিক দলগুলোর প্রকৃত অর্থায়নে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত হয় না এবং দলীয় আর্থিক ব্যবস্থাপনায় অনিয়ম ও অপ্রকাশিত আর্থিক লেনদেনের ঝুঁকি বৃদ্ধি করে।

রাজনৈতিক দলগুলোর প্রাক্কলিত বাৎসরিক ব্যয়

যেহেতু রাজনৈতিক দলের প্রকৃত আয়-ব্যয়ের তথ্য পাওয়া যায় না, সেহেতু একটি দলের আয়-ব্যয়ের প্রকৃত চিত্র অনুধাবন করতে দলগুলোর প্রকাশিত আয়-ব্যয়ের হিসাবের পাশাপাশি দল পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় সম্ভাব্য ব্যয়ের খাত ও অর্থের পরিমাণ বিবেচনা করা গুরুত্বপূর্ণ। একটি নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলকে শুধুমাত্র কেন্দ্রীয় পর্যায়ে নয়, বরং স্থানীয় পর্যায় পর্যন্ত সাংগঠনিক কার্যক্রম, প্রশাসনিক অবকাঠামো এবং রাজনৈতিক কর্মসূচি পরিচালনা করতে হয়। গবেষণায় বিভিন্ন দলের নেতা-কর্মীদের কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী দলীয় কার্যালয় পরিচালনা ব্যয় এবং বিভিন্ন সাংগঠনিক কার্যক্রম পরিচালনার ব্যয়ের ভিত্তিতে বিভিন্ন সাংগঠনিক স্তরে একটি রাজনৈতিক দল ব্যাপ্তি বিবেচনায় একটি দলের বার্ষিক ব্যয়ের হিসাব প্রাক্কলন করা হয়েছে।

নির্বাচন কমিশনের নিবন্ধন শর্ত অনুযায়ী একটি রাজনৈতিক দলের কমপক্ষে ২২টি জেলা এবং ১০১টি উপজেলা পর্যায়ে সাংগঠনিক উপস্থিতি থাকতে হয়। এই ন্যূনতম সাংগঠনিক কাঠামো বজায় রাখার জন্য কার্যালয় পরিচালনা, সভা-সমাবেশ আয়োজন, সাংগঠনিক সমন্বয় এবং প্রশাসনিক কার্যক্রম বাবদ একটি দলের সম্ভাব্য বার্ষিক ব্যয় প্রায় ১৪ থেকে ২৫ কোটি টাকা। এই হিসাব কেবলমাত্র ন্যূনতম সাংগঠনিক উপস্থিতি ও মৌলিক কার্যক্রম পরিচালনার ব্যয়কে প্রতিফলিত করা হয়েছে। এর মধ্যে বড় আকারের রাজনৈতিক কর্মসূচি, নির্বাচনকালীন কার্যক্রম অথবা বিশেষ সাংগঠনিক উদ্যোগের ব্যয় অন্তর্ভুক্ত নয়।

সারণি ১৯: নিবন্ধনের শর্ত হিসেবে ২২টি জেলা ও ১০১টি উপজেলায় কার্যালয় থাকা একটি দলের প্রাক্কলিত বাৎসরিক ব্যয়

ক্রম নং	ব্যয়ের খাত	সংখ্যা	প্রাক্কলিত মোট ব্যয় (টাকা)
	বাৎসরিক পরিচালন ব্যয়		
১	কেন্দ্রীয় অফিস পরিচালন	১	৮৮৮০০০ - ১৩২০০০০
২	মহানগর ও জেলা অফিস পরিচালন (২২টি জেলা)	২২	১৪৫২০০০০ - ১৮৬১২০০০
৩	উপজেলা ও থানা অফিস পরিচালন (১০১টি উপজেলা/থানা)	১০১	৪০০২৬০০০ - ৪৯৭৪০০০০
	মোট		৫৫৪৩৪০০০ - ৬৯৬৭২০০০
	বাৎসরিক কর্মসূচি ব্যয়		
৪	কেন্দ্রীয় পর্যায়	১	৬৫১০০০০ - ১০৫১০০০০
৫	মহানগর ও জেলা পর্যায় (২২টি জেলা)	২২	৪১৪১৫০০০ - ৫৮৪৬৫০০০
৬	উপজেলা ও থানা পর্যায় (১০১টি উপজেলা/থানা)	১০১	৩৮৩৮০০০০ - ১১১৬০৫০০০
	মোট		৮৬৩০৫০০০ - ১৮০৫৮০০০০
	সর্বমোট		১৪,১৭,৩৯,০০০ - ২৫,০২,৫২,০০০

*কার্যালয়ের মালিকানা, কর্মসূচী ধরন, সময়, ব্যবহার ও স্থানভেদে তারতম্য হতে পারে

** কার্যালয় পরিচালন ব্যয়ের খাতসমূহ: মাসিক অফিস ভাড়া; আপ্যায়ন ব্যয়; বিদ্যুৎ বিল এবং অন্যান্য (পানি বিল, স্টেশনারীজ ইত্যাদি)

*** কর্মসূচী সম্পর্কিত ব্যয়ের খাতসমূহ: সভা-সমাবেশ (মঞ্চ, ডেকোরেটর, সাউন্ড সিস্টেম ইত্যাদি); আপ্যায়ন ব্যয়; ব্যানার; প্রচারণা সামগ্রী (পোস্টার, মাইকিং ইত্যাদি) এবং যাতায়াত ব্যয়, বছরে ন্যূনতম ৫টি কর্মসূচী ধরে

যেসব রাজনৈতিক দল জেলা, মহানগর, উপজেলা এবং ইউনিয়ন পর্যায় পর্যন্ত কার্যকর সাংগঠনিক কাঠামো পরিচালনা করে থাকে, তাদের ক্ষেত্রে পূর্ণাঙ্গ তৃণমূলভিত্তিক সাংগঠনিক কাঠামো বজায় রাখতে বার্ষিক প্রায় ৩০২ থেকে ৩৯৩ কোটি টাকা ব্যয়ের প্রয়োজন হতে পারে। এ ধরনের ব্যয়ের মধ্যে স্থানীয় কার্যালয় এবং সাংগঠনিক কার্যক্রম পরিচালনার তথা সভা-সমাবেশ, প্রচার-প্রচারণা এবং নিয়মিত প্রশাসনিক কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। ফলে জাতীয় পর্যায়ের রাজনৈতিক দলগুলোর সাংগঠনিক উপস্থিতি বিস্তৃত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাদের আর্থিক প্রয়োজনও উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায়।

সারণি ২০: বাংলাদেশের ইউনিয়ন পর্যায় পর্যন্ত ইউনিট কার্যালয় থাকা একটি দলের প্রাক্কলিত বাৎসরিক ব্যয়

ক্রম	ব্যয়ের খাত	সংখ্যা	প্রাক্কলিত মোট ব্যয় (টাকা)
বাৎসরিক পরিচালন ব্যয়			
১	কেন্দ্রীয় অফিস পরিচালন	১	৮৮৮০০০ - ১৩২০০০০
২	মহানগর ও জেলা অফিস পরিচালন (১২টি মহানগর ও ৬৪টি জেলা)	৭৬	৪৮৩৬০০০০ - ৬১৫৯৬০০০
৩	উপজেলা ও থানা অফিস পরিচালন (৪৯৫টি উপজেলা ও ১২৬টি মহানগর এলাকার থানা)	৬২১	২৪৫৮৮৬০০০ - ৩০৫৪৮৪০০০
৪	পৌরসভা অফিস পরিচালন (৩২৯টি পৌরসভা)	৩২৯	৮৪৯১২০০০ - ১১৬৫০৮০০০
৫	ইউনিয়ন অফিস পরিচালন (৪৫৫৩টি ইউনিয়ন)	৪৫৫৩	৪৬৪৪১৮০০০ - ৬৫৫৬৫০০০০
মোট			৮৪,৪৪,৬৪,০০০ - ১,১৪,০৫,৫৮,০০০
বাৎসরিক কর্মসূচী পরিচালন ব্যয়			
৬	কেন্দ্রীয় পর্যায়	১	৬৫১০০০০ - ১০৫১০০০০
৭	মহানগর ও জেলা পর্যায় (১২টি মহানগর ও ৬৪টি জেলা)	৭৬	১৪৩০৭০০০০ - ২০১৯৭০০০০
৮	উপজেলা ও থানা পর্যায় (৪৯৫টি উপজেলা ও ১২৬টি মহানগর এলাকার থানা)	৬২১	৪৮৪৩৮০০০০ - ৬৮৬২০৫০০০
৯	পৌরসভা পর্যায় (৩২৯টি পৌরসভা)	৩২৯	১৬৪৫০০০০০ - ২০৭২৭০০০০
১০	ইউনিয়ন পর্যায় (৪৫৫৩টি ইউনিয়ন)	৪৫৫৩	১৩৭৭২৮২৫০০ - ১৬৮৪৬১০০০০
মোট			২১৭৫৭৪২৫০০ - ২৭৯০৫৬৫০০০
সর্বমোট			৩০২,০২,০৬,৫০০ - ৩৯৩,১১,২৩,০০০

*মালিকানা, কর্মসূচী ধরন, সময়, ব্যবহার ও স্থানভেদে তারতম্য হতে পারে

** কার্যালয় পরিচালন ব্যয়ের খাতসমূহ: মাসিক অফিস ভাড়া; আপ্যায়ন ব্যয়; বিদ্যুৎ বিল এবং অন্যান্য (পানি বিল, স্টেশনারীজ ইত্যাদি)

*** কর্মসূচী সম্পর্কিত ব্যয়ের খাতসমূহ: সভা-সমাবেশ (মঞ্চ, ডেকোরেটর, সাউন্ড সিস্টেম ইত্যাদি); আপ্যায়ন ব্যয়; ব্যানার; প্রচারণা সামগ্রী (পোস্টার, মাইকিং ইত্যাদি) এবং যাতায়াত ব্যয়, বছরে ন্যূনতম ৫টি কর্মসূচী ধরে

যদি কোনো রাজনৈতিক দল জেলা, মহানগর, উপজেলা, ইউনিয়ন বা পৌরসভা ছাড়িয়ে ইউনিয়নের ওয়ার্ড পর্যায় পর্যন্ত সক্রিয় সাংগঠনিক কাঠামো পরিচালনার জন্য বছরে প্রায় ১,৫৩২ থেকে ২,১৮৮ কোটি টাকা প্রয়োজন হতে পারে। এ ধরনের ব্যয় দলীয় কার্যালয় পরিচালনা, স্থানীয় সংগঠনের সভা, কর্মী সমন্বয়, রাজনৈতিক কার্যক্রম, যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং সাংগঠনিক তদারকির মতো ন্যূনতম প্রশাসনিক ও সাংগঠনিক কার্যক্রমের ভিত্তিতে নির্ধারিত হয়েছে।

সারণি ২১: বাংলাদেশের ইউনিয়নের ওয়ার্ড পর্যায় পর্যন্ত ইউনিট কার্যালয় থাকা একটি দলের প্রাক্কলিত বাৎসরিক ব্যয়

ক্রম	ব্যয়ের খাত	সংখ্যা	প্রাক্কলিত মোট ব্যয় (টাকা)
বাৎসরিক পরিচালন ব্যয় (বৃহৎ দল)			
১	কেন্দ্রীয় অফিস পরিচালন	১	৮৮৮০০০ - ১৩২০০০০
২	মহানগর ও জেলা অফিস পরিচালন (১২টি মহানগর ও ৬৪টি জেলা)	৭৬	৪৮৩৬০০০০ - ৬১৫৯৬০০০
৩	উপজেলা ও থানা অফিস পরিচালন (৪৯৫টি উপজেলা ও ১২৬টি মহানগর এলাকার থানা)	৬২১	২৪৫৮৮৬০০০ - ৩০৫৪৮৪০০০
৪	পৌরসভা অফিস পরিচালন (৩২৯টি পৌরসভা)	৩২৯	৮৪৯১২০০০ - ১১৬৫০৮০০০
৫	ইউনিয়ন অফিস পরিচালন (৪৫৫৩টি ইউনিয়ন)	৪৫৫৩	৪৬৪৪১৮০০০ - ৬৫৫৬৫০০০০

৬	ওয়ার্ড অফিস পরিচালন (৪৮০টি মহানগর ওয়ার্ড, ২৯৬১টি পৌর ওয়ার্ড ও ৪০৯৭৭টি ইউনিয়ন ওয়ার্ড)	৪৪৪১৮	৩১৯৮০৯৬০০০ - ৫০৬৩৬৫২০০০
	মোট		৪০৪২৫৬০০০০ - ৬২০৪২১০০০০
	বাৎসরিক কর্মসূচি পরিচালন ব্যয় (বৃহৎ দল)		
৭	কেন্দ্রীয় পর্যায়	১	৬৫১০০০০ - ১০৫১০০০০
৮	মহানগর ও জেলা পর্যায় (১২টি মহানগর ও ৬৪টি জেলা)	৭৬	১৪৩০৭০০০০ - ২০১৯৭০০০০
৯	উপজেলা ও থানা পর্যায় (৪৯৫টি উপজেলা ও ১২৬টি মহানগর এলাকার থানা)	৬২১	৪৮৪৩৮০০০০ - ৬৮৬২০৫০০০
১০	পৌরসভা পর্যায় (৩২৯টি পৌরসভা)	৩২৯	১৬৪৫০০০০০ - ২০৭২৭০০০০
১১	ইউনিয়ন পর্যায় (৪৫৫৩টি ইউনিয়ন)	৪৫৫৩	১৩৭৭২৮২৫০০ - ১৬৮৪৬১০০০০
১২	ওয়ার্ড পর্যায় (৪৮০টি মহানগর ওয়ার্ড, ২৯৬১টি পৌর ওয়ার্ড ও ৪০৯৭৭টি ইউনিয়ন ওয়ার্ড)	৪৪৪১৮	৯১০৫৬৯০০০০ - ১২৮৮১২২০০০০
	মোট		১১২৮১৪৩২৫০০ - ১৫৬৭১৭৮৫০০০
	সর্বমোট		১৫,৩২,৩৯,৯২,৫০০ - ২১,৮৭,৫৯,৯৫,০০০

*মালিকানা, কর্মসূচী ধরন, সময়, ব্যবহার ও স্থানভেদে তারতম্য হতে পারে

** কার্যালয় পরিচালন ব্যয়ের খাতসমূহ: মাসিক অফিস ভাড়া; আপ্যায়ন ব্যয়; বিদ্যুৎ বিল এবং অন্যান্য (পানি বিল, স্টেশনারীজ ইত্যাদি)

*** কর্মসূচি সম্পর্কিত ব্যয়ের খাতসমূহ: সভা-সমাবেশ (মঞ্চ, ডেকোরেশন, সাউন্ড সিস্টেম ইত্যাদি); আপ্যায়ন ব্যয়; ব্যানার; প্রচারণা সামগ্রী (পোস্টার, মাইকিং ইত্যাদি) এবং যাতায়াত ব্যয়, বছরে ন্যূনতম ৫টি কর্মসূচি ধরে

রাজনৈতিক দলসমূহের প্রাক্কলিত আয়

অধিকাংশ রাজনৈতিক দল তাদের আর্থিক বিবরণী নিয়মিতভাবে প্রকাশ করে না এবং যেসব তথ্য নির্বাচন কমিশনে জমা দেয়, সেগুলোও সর্বক্ষেত্রে জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত নয়। ফলে রাজনৈতিক দলগুলোর প্রকৃত আয় নির্ধারণ করা একটি দুরূহ বিষয়। একই সাথে অনুদান, মনোনয়ন ফি, তহবিল সংগ্রহ, সম্পদ থেকে আয় এবং অন্যান্য উৎসের অর্থায়ন সম্পর্কিত তথ্যের স্বচ্ছতার ঘাটতির কারণে দলগুলোর প্রকৃত আয়ের পরিমাণ নির্ধারণ করা কঠিন। তবে দলীয় গঠনতন্ত্রে উল্লেখিত সদস্যসংখ্যা এবং সদস্য চাঁদার ন্যূনতম হার বিশ্লেষণের মাধ্যমে রাজনৈতিক দলগুলোর সম্ভাব্য ন্যূনতম আয় সম্পর্কে একটি ধারণা পাওয়া সম্ভব।

গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত দুইটি দলের গঠনতন্ত্রে প্রতিটি সাংগঠনিক পর্যায়ে নির্বাহী ও সাধারণ সদস্যদের ন্যূনতম সংখ্যা এবং তাদের প্রদেয় চাঁদার হার উল্লেখ রয়েছে। এই তথ্যের ভিত্তিতে শুধুমাত্র সদস্য চাঁদাকে বিবেচনায় নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর সম্ভাব্য ন্যূনতম বার্ষিক আয় প্রাক্কলন করা হয়েছে। উল্লেখ্য, এই হিসাবের মধ্যে অনুদান, মনোনয়ন ফি, বিশেষ অর্থসংগ্রহ কার্যক্রম, ব্যবসায়িক আয় কিংবা দলীয় সম্পদ থেকে অর্জিত অর্থ অন্তর্ভুক্ত নয়। ফলে এই প্রাক্কলন একটি দলের সার্বিক মোট আয়ের হিসেব নয়।

নির্বাচন কমিশনের নিবন্ধন শর্ত অনুযায়ী একটি রাজনৈতিক দলের কমপক্ষে ২২টি জেলা এবং ১০১টি উপজেলা পর্যায়ে সংগঠন থাকতে হয়। সংশ্লিষ্ট স্তরসমূহে গঠনতন্ত্রে নির্ধারিত ন্যূনতম সদস্যসংখ্যা ও চাঁদার হার অনুসারে হিসাব করলে একটি দলের সম্ভাব্য ন্যূনতম বার্ষিক সদস্য-চাঁদা থেকে আয় প্রায় ২৬ লাখ টাকা হতে পারে। এই পরিমাণ অর্থ একটি নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলের মৌলিক সদস্যভিত্তিক আর্থিক সক্ষমতার নির্দেশনা দিলেও এটি দল পরিচালনার সম্ভাব্য ব্যয়ের তুলনায় অত্যন্ত সীমিত। ফলে নিবন্ধিত একটি রাজনৈতিক দল শুধুমাত্র সদস্য চাঁদার ওপর নির্ভর করে কার্যক্রম পরিচালনা করতে সক্ষম হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম।

সারণি ২২: নিবন্ধনের শর্ত হিসেবে ২২টি জেলা ও ১০১টি উপজেলায় কার্যালয় থাকা একটি দলের শুধু কর্মীদের চাঁদা থেকে প্রাক্কলিত বাৎসরিক আয়*

ক্রম	প্রশাসনিক পর্যায়	ইউনিট/কমিটি থেকে আদায়কৃত মাসিক চাঁদার পরিমাণ (টাকা)	মোট ইউনিট/কমিটির সংখ্যা	মোট বাৎসরিক চাঁদার পরিমাণ (টাকা)
		ক	খ	ক x খ x ১২
১	কেন্দ্রীয় পর্যায়**	১০,৫০০	১টি	১,২৬,০০০
২	জেলা পর্যায়***	১৫০	২২টি	৩৯,৬০০
৩	উপজেলা/মহানগর থানা পর্যায়****	২,০০০	১০১টি	২৪,২৪,০০০
	সর্বমোট			২৫,৮৯,৬০০

* সদ্য নিবন্ধন প্রাপ্ত একটি রাজনৈতিক দলের বিভিন্ন কমিটির সদস্য সংখ্যা ও চাঁদার হার অনুসারে প্রাক্কলিত
 **গঠনতন্ত্রে সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা না থাকায়, কেন্দ্রীয় কমিটির ২১ জন সদস্যের চাঁদার পরিমাণ জন প্রতি ৫০০ টাকা করে ধরে হিসাব করা হয়েছে
 ***জেলা কমিটির ১৫ জন সদস্যের চাঁদার পরিমাণ জন প্রতি ১০ টাকা করে ধরে হিসাব করা হয়েছে
 ****উপজেলা পর্যায়ে কমিটির সদস্যসহ ২০০ সাধারণ সদস্যের চাঁদার পরিমাণ জন প্রতি ১০ টাকা করে ধরে হিসাব করা হয়েছে

যেসব রাজনৈতিক দল জেলা, মহানগর, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায় পর্যন্ত সাংগঠনিক কাঠামো পরিচালনা করে, তাদের ক্ষেত্রে সদস্যসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় সদস্য চাঁদা থেকেও আয় বৃদ্ধি পায়। গবেষণার প্রাক্কলন অনুযায়ী, এই ধরনের একটি পূর্ণাঙ্গ তৃণমূলভিত্তিক সংগঠনের বার্ষিক সদস্য-চাঁদা থেকে আয় প্রায় ৩৮ কোটি টাকা পর্যন্ত হতে পারে।

সারণি ২৩: ইউনিয়ন পর্যায় পর্যন্ত কমিটি থাকা একটি দলের শুধু কর্মীদের চাঁদা থেকে প্রাক্কলিত বাৎসরিক আয়*

ক্রম	প্রশাসনিক পর্যায়	ইউনিট/কমিটি থেকে আদায়কৃত মাসিক চাঁদার পরিমাণ (টাকা)**	মোট ইউনিট/কমিটির সংখ্যা	মোট বাৎসরিক চাঁদার পরিমাণ (টাকা)
		ক	খ	ক x খ x ১২
১	কেন্দ্রীয় পর্যায়***	২,৩৬,৫০০	১	২৮,৩৮,০০০
২	জেলা পর্যায়	১৯,৪০০	৬৪	১,৪৮,৯৯,২০০
৩	মহানগর পর্যায়	১৪,৭০০	১২	২১,১৬,৮০০
৪	উপজেলা/মহানগরের থানা পর্যায়	৫,৮১০	৬২১	৪,৩২,৯৬,১২০
৫	পৌরসভা পর্যায়	৪,৮২০	৩২৯	১,৯০,২৯,৩৬০
৬	ইউনিয়ন ও পৌর/মহানগর ওয়ার্ড পর্যায়****	৩,০৬০	৭,৯৯৪	২৯,৩৫,৩৯,৬৮০
	সর্বমোট			৩৭,৫৭,১৯,১৬০

* দেশের সকল জেলা থেকে ইউনিয়ন পর্যায় পর্যন্ত কমিটি রয়েছে এমন একটি দলের বিভিন্ন কমিটির সদস্য সংখ্যা ও চাঁদার হার অনুসারে প্রাক্কলিত
 ** গঠনতন্ত্রে সকল পর্যায়ের কমিটির সদস্যের সংখ্যা অনুযায়ী নির্ধারিত মাসিক চাঁদার হার অনুযায়ী প্রাক্কলন করা হয়েছে
 *** গঠনতন্ত্রে সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা না থাকায়, কেন্দ্রীয় কমিটির চাঁদার পরিমাণ জন প্রতি জেলা পর্যায়ের চাঁদার পরিমাণ অনুসারে ৫০০ টাকা ধরে হিসাব করা হয়েছে

যেসব রাজনৈতিক দল ইউনিয়নের ওয়ার্ড পর্যায় পর্যন্ত সাংগঠনিক কার্যক্রম বিস্তার করেছে, তাদের সদস্যসংখ্যা কয়েকগুণ বৃদ্ধি পেতে পারে। গবেষণার হিসাব অনুসারে, গঠনতন্ত্রে নির্ধারিত ন্যূনতম সদস্যসংখ্যা ও চাঁদার হার কার্যকরভাবে বাস্তবায়িত হলে একটি ওয়ার্ডভিত্তিক পূর্ণাঙ্গ রাজনৈতিক দল শুধুমাত্র সদস্যদের চাঁদা থেকেই বছরে প্রায় ১১৬ কোটি টাকা আয় করতে পারে।

সারণি ২৪: ইউনিয়নের ওয়ার্ড পর্যায় পর্যন্ত কমিটি থাকা একটি দলের শুধু কর্মীদের চাঁদা থেকে প্রাক্কলিত বাৎসরিক আয়*

ক্রম	প্রশাসনিক পর্যায়	ইউনিট/কমিটি থেকে আদায়কৃত মাসিক চাঁদার পরিমাণ (টাকা)**	মোট ইউনিট/কমিটির সংখ্যা	মোট বাৎসরিক চাঁদার পরিমাণ (টাকা)
		ক	খ	ক x খ x ১২
১	কেন্দ্রীয় কমিটি***	২,৩৬,৫০০	১	২৮,৩৮,০০০
২	জেলা	১৯,৪০০	৬৪	১,৪৮,৯৯,২০০
৩	মহানগর	১৪,৭০০	১২	২১,১৬,৮০০
৪	উপজেলা/মহানগরের থানা	৫,৮১০	৬২১	৪,৩২,৯৬,১২০
৫	পৌরসভা	৪,৮২০	৩২৯	১,৯০,২৯,৩৬০
৬	ইউনিয়ন ও পৌর/মহানগর ওয়ার্ড****	৩,০৬০	৭,৯৯৪	২৯,৩৫,৩৯,৬৮০
৭	ইউনিয়নের ওয়ার্ড	১,৬০০	৪০,৯৭৭	৭৮,৬৭,৫৮,৪০০
	সর্বমোট			১,১৬,২৪,৭৭,৫৬০

* দেশের সকল জেলা থেকে ওয়ার্ড পর্যায় পর্যন্ত কমিটি রয়েছে এমন একটি দলের বিভিন্ন কমিটির সদস্য সংখ্যা ও চাঁদার হার অনুসারে প্রাক্কলিত
 ** গঠনতন্ত্রে সকল পর্যায়ের কমিটির সদস্যের সংখ্যা অনুযায়ী নির্ধারিত মাসিক চাঁদার হার অনুযায়ী প্রাক্কলন করা হয়েছে

*** গঠনতন্ত্রে সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা না থাকায়, কেন্দ্রীয় কমিটির চাঁদার পরিমাণ জন প্রতি জেলা পর্যায়ের চাঁদার পরিমাণ অনুসারে ৫০০ টাকা ধরে হিসাব করা হয়েছে

***পৌরসভা ও মহানগর পর্যায়ে ৯টি করে ওয়ার্ড ধরে সদস্যসংখ্যা হিসাব করা হয়েছে

এই প্রাক্কলিত আয় ও ব্যয়ের হিসাব থেকে ধারণা করা যায় যে, রাজনৈতিক দলগুলোর আর্থিক স্থায়িত্ব মূলত সদস্যভিত্তিক অর্থায়নের পরিবর্তে বিকল্প অর্থায়ন উৎসের ওপর নির্ভরশীল। একই সঙ্গে প্রকাশিত আর্থিক প্রতিবেদন, সম্ভাব্য সাংগঠনিক ব্যয় এবং সদস্য-চাঁদা থেকে প্রাপ্ত সম্ভাব্য আয়ের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ব্যবধান রাজনৈতিক অর্থায়নের প্রকৃতি ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত হয়নি।

রাজনৈতিক দলসমূহের অর্থ সংগ্রহ প্রক্রিয়া

রাজনৈতিক দলগুলোর প্রকাশিত আয় এবং কার্যকর সাংগঠনিক কাঠামো পরিচালনার সম্ভাব্য ব্যয়ের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ব্যবধান বিদ্যমান। রাজনৈতিক দলগুলো আয় ও ব্যয়ের ব্যবধান পূরণের জন্য আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক উভয় ধরনের অর্থায়ন ব্যবস্থার ওপর নির্ভর করে, যা দলের আর্থিক প্রতিবেদনে দলীয় আয়-ব্যয় হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয় না। অধিকাংশ রাজনৈতিক দলের বিভিন্ন কর্মসূচি, রাজনৈতিক কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে প্রয়োজন অনুযায়ী তাৎক্ষণিকভাবে অর্থ সংগ্রহ করা হয়। বিশেষত স্থানীয় পর্যায়ে দলীয় কার্যালয় পরিচালনা, সভা-সমাবেশের আয়োজন, কর্মীদের যাতায়াত ব্যয় এবং অন্যান্য সাংগঠনিক কার্যক্রমের অর্থ অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্থানীয় নেতাদের ব্যক্তিকেন্দ্রিক অর্থায়নের মাধ্যমে নির্বাহ করা হয়। ফলে এসব অর্থের একটি বড় অংশ দলীয় হিসাব ব্যবস্থায় প্রতিফলিত হয় না। বিশেষত ক্ষমতায় থাকা অথবা ক্ষমতায় যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে এমন রাজনৈতিক দলগুলোর ক্ষেত্রে বিভিন্ন ব্যবসায়ী, শিল্পোদ্যোক্তাসহ বিত্তবান ব্যক্তিদের নিকট থেকে জোরপূর্বক অর্থ আদায় করা হয়ে থাকে। অন্যদিকে, বড় রাজনৈতিক দলগুলোতে ব্যবসায়ীসহ বিভিন্ন বিত্তশালী ব্যক্তিগণের দলীয় গুরুত্বপূর্ণ পদ বা নির্বাচনে মনোনয়ন বা ভবিষ্যতে সুযোগ-সুবিধা পেতে বড় অংকের চাঁদা বা অনুদান প্রদান করে। কিছু কিছু দল তৃণমূল পর্যায়ে গণচাঁদা সংগ্রহ বা ক্রাউড ফান্ডিং এর মাধ্যমে অর্থ সংগ্রহ করে থাকে। রাজনৈতিক দলগুলোর বিপুল আর্থিক চাহিদা এবং স্বচ্ছ অর্থায়ন কাঠামোর সীমাবদ্ধতা দুর্বৃত্তায়ন ও অপরাধের রাজনীতিকরণের ঝুঁকি সৃষ্টি করেছে। সাংগঠনিক ব্যয়ের তুলনায় আনুষ্ঠানিক আয়ের উৎস সীমিত কারণে দলগুলো বিকল্প এবং প্রায়শই অনানুষ্ঠানিক অর্থায়নের উৎসের ওপর অধিক নির্ভরশীল হয়েছে। রাজনৈতিক দলের বিপুল পরিমাণ অর্থের চাহিদা রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন ও অপরাধের রাজনীতিকরণের ঝুঁকি সৃষ্টি করে এবং একইসাথে ব্যক্তি নির্ভরতার কারণে দলের মধ্যে ‘প্যাট্রন-ক্লায়েন্ট’ সম্পর্ক তৈরি।

রাজনৈতিক অর্থায়নের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক দলসমূহের এ ধরনের কার্যক্রম সর্বজনীন নয় এবং সকল দলের ক্ষেত্রে সমানভাবে প্রযোজ্য নয়। তবে, বাস্তব চর্চায় রাজনৈতিক অর্থায়নে অনানুষ্ঠানিক ও নিয়ন্ত্রণহীন অর্থ প্রবাহের উপস্থিতি রাজনৈতিক অর্থ ব্যবস্থাপনায় রাজনৈতিক দলগুলোর প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা ও জবাবদিহির ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়। পাশাপাশি, বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলোর ক্ষেত্রে ব্যক্তিকেন্দ্রিক এবং অনানুষ্ঠানিক অর্থ গ্রহণের প্রবণতা পৃষ্ঠপোষকতামূলক সম্পর্ক বিকাশের জন্য অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। ফলে অর্থনৈতিক প্রভাবশালী গোষ্ঠী দলীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং প্রার্থী মনোনয়নসহ সাংগঠনিক কার্যক্রমে প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষমতা অর্জন করে।

অনিয়ম-দুর্নীতি

রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন ও অপরাধের রাজনীতিকরণ

সাধারণত রাজনীতির অপরাধায়ন বলতে বুঝায় অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত ব্যক্তি বা গোষ্ঠী রাজনৈতিক দল ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে রাজনৈতিক ক্ষমতা, বৈধতা এবং সুরক্ষা অর্জনের সুযোগ গ্রহণ করা। রাজনৈতিক অপরাধায়নে মূলত রাজনীতি এবং অপরাধী গোষ্ঠীর মধ্যে পারস্পরিক সুবিধাভিত্তিক সম্পর্কের মাধ্যমে রাজনৈতিক দলগুলো অর্থ, পেশিজ্ঞান ও সাংগঠনিক সহায়তা লাভ করে এবং অপরাধী গোষ্ঠীগুলো রাজনৈতিক সুরক্ষা, সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা ও প্রভাব বিস্তারের সুযোগ গ্রহণ করে।

গবেষণার অন্তর্ভুক্ত ১৮টি রাজনৈতিক দলের গঠনতন্ত্রে সদস্য হওয়ার যোগ্যতা হিসেবে ন্যূনতম শুদ্ধাচার, নৈতিকতা, সচ্চরিত্র, স্বচ্ছতা বা অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ততার বিষয়ে সুস্পষ্ট ও কার্যকর মানদণ্ডের ঘাটতি রয়েছে। একইভাবে, অপরাধের অভিযোগে অভিযুক্ত বা অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে সম্পৃক্ত ব্যক্তিদের দলীয় সদস্যপদ গ্রহণ, নেতৃত্বস্থানীয় দলীয় পদ পাওয়া, বা নির্বাচনী মনোনয়ন লাভের ক্ষেত্রে অধিকাংশ দলের গঠনতন্ত্রে প্রতিরোধমূলক কোনো ব্যবস্থা নেই। ফলে রাজনৈতিক আদর্শ, সাংগঠনিক অবদান কিংবা সামাজিক অবস্থানের পাশাপাশি অর্থনৈতিক সক্ষমতা, স্থানীয় প্রভাব, জনবল সংগঠনের ক্ষমতা এবং পেশিজ্ঞান ব্যবহারের সক্ষম ব্যক্তিদের রাজনৈতিক দলে যোগ দেওয়ার পর্যাপ্ত সুযোগ রয়েছে।

রাজনৈতিক দলগুলোকে দলীয় কার্যক্রম পরিচালনা, সাংগঠনিক বিস্তার, নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতা, স্থানীয় পর্যায়ে প্রভাব বিস্তার এবং রাজনৈতিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে প্রায়শই অর্থ ও পেশি শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিদের ওপর নির্ভর করতে হয়। অন্যদিকে অবৈধ অর্থ উপার্জনকারী, চাঁদাবাজ, চোরাচালানকারী, মানব পাচারকারী, অস্ত্র ও মাদক ব্যবসায়ীসহ বিভিন্ন অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে সম্পৃক্ত ব্যক্তিরা রাজনৈতিক দলের সদস্য ও সাংগঠনিক গুরুত্বপূর্ণ পদে আসীন হয়ে রাজনৈতিক ও সামাজিক বৈধতা অর্জন করে।

বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে তুলনামূলকভাবে ক্ষমতায় থাকা বা ক্ষমতায় যাওয়ার সম্ভাবনা আছে এমন রাজনৈতিক দলগুলোতে অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে সম্পৃক্ত ব্যক্তিদের উপস্থিতি বেশি। এ ক্ষেত্রে রাজনৈতিক দল ও অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত ব্যক্তি উভয়ের রাজনৈতিক অঙ্গীকার শুধু আদর্শিক অবস্থানের ভিত্তিতে গড়ে ওঠে না। বরং উভয় পক্ষই অর্থনৈতিক স্বার্থ রক্ষা, বিচারিক ও প্রশাসনিক ঝুঁকি হ্রাস এবং সামাজিক প্রভাব সম্প্রসারণের কৌশলগত কারণে সম্পর্ক গড়ে তোলে। ফলে রাজনৈতিক দলসমূহে অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক প্রতিযোগিতা ও অংশগ্রহণ ক্রমবর্ধমানভাবে নীতি ও আদর্শভিত্তিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার পরিবর্তে সম্পদ, পৃষ্ঠপোষকতামূলক সম্পর্ক, অর্থনৈতিক সক্ষমতার ওপর নির্ভরশীল হয়েছে।

রাজনৈতিক অপরাধায়নের এই প্রবণতার সবচাইতে বেশি লক্ষণীয় হয়ে ওঠে নির্বাচনের সময়ে। বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত বিগত পাঁচটি জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী প্রার্থীদের মধ্যে প্রায় ১৮ থেকে ৩২ শতাংশের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অপরাধে সম্পৃক্ততার অভিযোগে এক বা একাধিক মামলা ছিল। তবে মামলার উপস্থিতিই কোনো রাজনৈতিক ব্যক্তি অপরাধী হিসেবে বিবেচিত হয় না, তথাপি উল্লেখযোগ্য সংখ্যক বিতর্কিত ব্যক্তির নির্বাচনে অংশগ্রহণ এবং রাজনৈতিক দলগুলো প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন দেওয়া প্রাতিষ্ঠানিক নৈতিকতা ও জবাবদিহি চর্চার ঘাটতি নির্দেশ করে।

বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে রাজনৈতিক অপরাধায়নের এই চিত্র নতুন নয়; বরং দীর্ঘসময় ধরে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ক্ষমতায় আসীন হয়ে অপরাধায়নের সংস্কৃতি নিজের সুবিধার্থে গড়ে তুলেছে এবং রাজনৈতিক পরিসরে অপরাধায়নকে স্বাভাবিকরণ করেছে। বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর বিপুল পরিমাণ অবৈধ অস্ত্রের সহজলভ্যতা, অর্থনৈতিক সংকট এবং দুর্বল রাষ্ট্রীয় প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর কারণে বিভিন্ন রাজনৈতিক শক্তি স্থানীয় পর্যায়ে সংগঠন বিস্তার ও প্রভাব প্রতিষ্ঠার জন্য যুব ও ছাত্রভিত্তিক ক্যাডার গোষ্ঠী গড়ে তোলে। পরবর্তীতে সামরিক শাসনামলে (১৯৭৫-১৯৯০) রাজনৈতিক বৈধতা অর্জনের লক্ষ্যে শাসকগোষ্ঠী স্থানীয় প্রভাবশালী ব্যক্তি, মস্তান ও বিভিন্ন অনানুষ্ঠানিক শক্তিকে রাজনৈতিক কাঠামোর সঙ্গে সম্পৃক্ত করার মাধ্যমে রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতার সুযোগ গড়ে তোলে (জাহান, ১৯৮০; খান, ১৯৮৯; সোবহান, ১৯৯৩)।

১৯৯১ সালে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হলেও রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা ক্রমশ সংঘাতময় রূপ লাভ করে। রাজনৈতিক দলগুলো নির্বাচন, স্থানীয় নিয়ন্ত্রণ ও দলীয় আধিপত্য নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রভাবশালী স্থানীয় গোষ্ঠী ও পেশিশক্তির ব্যবহার রাজনৈতিকরণ করে (কোচানেক, ২০০০; রিয়াজ, ২০০৪)। এ সময় টেন্ডার নিয়ন্ত্রণ, চাঁদাবাজি, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও স্থানীয় পর্যায়ে দখলদারিত্ব রাজনৈতিক অর্থায়নের গুরুত্বপূর্ণ উৎসে পরিণত হয় (ডিভাইন, ২০০৭; সুকেন্স, ২০১৮)। পরবর্তীকালে দীর্ঘমেয়াদি একদলীয় প্রাধান্যের সময়ে (২০০৯-২০২৪) এ প্রবণতা আরও প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করে এবং রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতা, রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের দলীয়করণসহ মনোনয়ন ও ক্ষমতা বন্টনের সঙ্গে বিভ্রাটালী গোষ্ঠীর সম্পৃক্ততা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায় (রিয়াজ, ২০১৯)। এর ফলে রাজনীতির অপরাধায়ন কেবল স্থানীয় সহিংসতা বা পেশিশক্তির ব্যবহারের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে রাজনৈতিক ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর বিভিন্ন স্তরে বিস্তৃত হয়েছে।

পরিশেষে বলা যায় যে, রাজনৈতিক দলগুলোতে সদস্যপদসহ নির্বাচনী প্রার্থী বাছাই করার ক্ষেত্রে কার্যকর নৈতিক মানদণ্ডের অভাব, অর্থ ও সাংগঠনিক কার্যক্রম পেশিশক্তির মাধ্যমে বিস্তার করার প্রবণতা এবং অপরাধের সাথে জড়িত ব্যক্তিদের রাজনৈতিক সুবিধা প্রদানের প্রবণতা বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিবেশে অপরাধায়নকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিয়েছে।

সার্বিক পর্যবেক্ষণ

গবেষণা দেখা যায় যে, রাজনৈতিক দলগুলোর প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রমে সুশাসনের প্রতিটি নির্দেশক তথা স্বচ্ছতা, জবাবদিহি, গণতান্ত্রিক চর্চা, অংশগ্রহণ ও অন্তর্ভুক্তি, অনিয়ম-দুর্নীতি প্রতিরোধে ব্যাপক ঘাটতি বিদ্যমান। রাজনৈতিক দলের নিবন্ধন ও জাতীয় নির্বাচনে অংশগ্রহণসহ সার্বিক কার্যক্রমসংশ্লিষ্ট আইন ও বিধিমালা বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও রাজনৈতিক দলগুলোর অভ্যন্তরীণ গণতান্ত্রিক চর্চা, রাজনৈতিক অর্থায়নে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিতকরণে একটি শক্তিশালী আইনি কাঠামোর ঘাটতি রয়েছে। একই সাথে বিদ্যমান আইনি কাঠামোর সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধিবিধান আন্তর্জাতিক উত্তম চর্চার সাথেও সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। অন্যদিকে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানসহ সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রীয় আইন, বিধি-বিধান ও দলীয় গঠনতন্ত্র পরিপালন না করার প্রবণতাও লক্ষণীয়। দলগুলো কর্তৃক যতটুকু আইন পরিপালন করা হয় তা মূলত প্রতীকী অর্থে। রাজনৈতিক দলের নিবন্ধনের যে বিদ্যমান মানদণ্ড বা ব্যবস্থা রয়েছে তার কোনো কোনো নির্দেশক অন্যান্য দেশের উত্তম চর্চার সাথে সামঞ্জস্যহীন ও অতি-নিয়ন্ত্রণমূলক। অন্যদিকে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহির কার্যকর পদ্ধতির অনুপস্থিতির কারণে আইনি শর্তভিত্তিক ব্যবস্থাটি অঙ্কুরেই অর্থ-নির্ভর প্রতিযোগিতামূলক পৃষ্ঠপোষকতা (কম্পিটেটিভ ক্লায়েন্টিলিজম) তৈরি করে, যা দলগুলোকে ব্যবসায়ীসহ বিত্তশালীদের পৃষ্ঠপোষকতার মাধ্যমে নিজেদের কার্যক্রম পরিচালনা করতে বাধ্য করে।

বিদ্যমান রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে দলগুলোর কার্যক্রম পরিচালনায় বিপুল পরিমাণ অর্থ প্রয়োজন হয়। দলগুলোর এই বিপুল পরিমাণ অর্থের ব্যবস্থাপনা অনানুষ্ঠানিক প্রক্রিয়ায় পরিচালিত হয় এবং যা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ব্যক্তি-নির্ভর। যেখানে স্বচ্ছতার ঘাটতি বিদ্যমান এবং রাজনৈতিক দলগুলোর আনুষ্ঠানিকভাবে প্রদত্ত আয়-ব্যয়ের হিসাব ও বাস্তবতার মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য লক্ষ করা যায়। রাজনৈতিক অর্থায়নে ব্যক্তিনির্ভরতা এবং অনানুষ্ঠানিক খাত বা উৎসের প্রাধান্য দলগুলোতে ব্যক্তি ও পরিবারকেন্দ্রিক রাজনীতি বিকাশে সহায়তা করেছে। অন্যদিকে রাজনৈতিক দলে বিশেষত প্রভাবশালী দলগুলোতে কালো টাকা, রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন ও অন্তর্দ্বন্দ্ব বিকশিত হচ্ছে। যা অনেকক্ষেত্রে রাজনৈতিক অংশগ্রহণ বা দলীয় অবস্থানকে ক্ষমতাকেন্দ্রিক বিজনেস মডেলে পরিণত করেছে।

আইনি বাধ্যবাধকতা ও রাজনৈতিক দলগুলোর অঙ্গীকার থাকলেও বিভিন্ন ক্ষেত্রে দলে নারীদের অন্তর্ভুক্তিতে দৃশ্যমান অগ্রগতি নেই। নারী কর্মীদের অন্তর্ভুক্তির ক্ষেত্রে দলগুলোর অনীহা লক্ষ করা যায় এবং ক্ষেত্রবিশেষে দলগুলোতে নারীদের উপস্থিতি নামমাত্র বা প্রতীকী। দলীয় কার্যক্রমে গণতান্ত্রিক চর্চা ও তৃণমূল পর্যায়ের অংশগ্রহণ এবং নারী কর্মীদের অন্তর্ভুক্তির ঘাটতির ফলে দলগুলোতে একক বা ব্যক্তিকেন্দ্রিক নেতৃত্ব, পরিবারতন্ত্র, কর্তৃত্বপরায়ণতা, অভিজাততন্ত্র ও পুরুষতান্ত্রিকতা গভীরতর হচ্ছে।

কোনো কোনো ক্ষেত্রে সাংগঠনিক পদক্ষেপের নামে অ্যাডহকভিত্তিক ব্যবস্থা গ্রহণের বাইরে দলগুলোতে অনিয়ম-দুর্নীতিসহ ক্ষমতার অপব্যবহাওে কার্যকর প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা না থাকায় এবং জবাবদিহি ব্যবস্থার ঘাটতির ফলে বিশেষ করে বৃহৎ রাজনৈতিক দলগুলোকে অর্থ ও পেশিশক্তির ব্যবহার ও রাজনৈতিক সহিংসতা স্বাভাবিকতায় পরিণত হচ্ছে। এ প্রেক্ষিতে গণতন্ত্রের অন্যতম প্রতিষ্ঠান রাজনৈতিক দলের প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রমে সুশাসন নিশ্চিত করতে অভ্যন্তরীণ সংস্কার অপরিহার্য এবং এই সংস্কারের দায়-দায়িত্ব রাজনৈতিক দলগুলোকেই নিতে হবে।

সুপারিশ

রাজনৈতিক দলগুলোর প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রমে সুশাসন নিশ্চিত করতে গবেষণার ফলাফলের আলোকে নিম্নোক্ত সুপারিশ প্রস্তাব করা হলো-

১. রাজনৈতিক দলের কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করতে গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (আরপিও), ১৯৭২ এবং রাজনৈতিক দল নিবন্ধন বিধিমালা, ২০০৮ এর প্রয়োজনীয় সংশোধন করতে হবে, যার মধ্যে থাকবে-

- আন্তর্জাতিক উত্তম চর্চার আলোকে রাজনৈতিক দল নিবন্ধনের শর্ত সহজ এবং নির্দিষ্ট সময় অন্তর পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন সাপেক্ষে নিবন্ধন নবায়ন করা।
- আরপিও, ১৯৭২ অনুযায়ী সংসদ সদস্য নির্বাচনে অযোগ্য ব্যক্তিদের কোনো নিবন্ধিত দলের সাধারণ/কমিটির সদস্য না করা।
- নির্বাচনে প্রার্থী মনোনয়নের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট এলাকার দলের স্থানীয় সদস্যদের গোপন ভোটে তৈরি প্যানেল থেকে কেন্দ্রীয় মনোনয়ন বোর্ড কর্তৃক মনোনয়ন চূড়ান্ত করা।
- জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দলীয় মনোনয়নের ক্ষেত্রে প্রার্থীর তিন বছরের দলীয় সদস্যপদ থাকা বাধ্যতামূলক করা।

- সকল দলের আর্থিক প্রতিবেদন জনসমক্ষে প্রকাশ বাধ্যতামূলক করা।
 - রাজনৈতিক দলগুলোর জন্য মানসম্মত যুগোপযোগী হিসাবরক্ষণ ব্যবস্থা প্রবর্তন ও বাস্তবায়ন বাধ্যতামূলক করা।
 - দলের সব পর্যায়ে সুনির্দিষ্ট সীমার ওপরে আর্থিক লেনদেন ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে পরিচালনা বাধ্যতামূলক করা।
 - আর্থিক প্রতিবেদনে কেন্দ্রীয় পর্যায়ের সাথে সুস্পষ্টভাবে স্থানীয় পর্যায়ের সকল আয়-ব্যয়ের হিসাব অন্তর্ভুক্ত করা।
 - নির্বাচন কমিশনকে রাজনৈতিক দল কর্তৃক প্রদত্ত বার্ষিক নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন যাচাইয়ের ক্ষমতা প্রদান করা।
 - রাজনৈতিক দলগুলোর জন্য হালনাগাদকৃত তথ্য সম্বলিত ওয়েবসাইট পরিচালনা বাধ্যতামূলক করা।
২. রাজনৈতিক দলগুলোকে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ -এর আওতায় নিয়ে আসতে হবে।
 ৩. নির্বাচন কমিশনের রাজনৈতিক দলের নিবন্ধন প্রদান বিষয়ক কার্যক্রমে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে হবে।
 ৪. নির্বাচন কমিশন কর্তৃক রাজনৈতিক দলগুলোর আর্থিক হিসাব যাচাই ও সাংগঠনিক কার্যক্রমের তদারকি বৃদ্ধি এবং আইনি বাধ্যবাধকতা লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
 ৫. নির্বাচন কমিশন কর্তৃক রেজিস্টার্ড চার্টার্ড একাউন্টিং ফার্মের একটি তালিকা তৈরি এবং তালিকাভুক্ত ফার্মের মাধ্যমে রাজনৈতিক দলগুলোর আর্থিক লেনদেনের নিরীক্ষা সম্পাদন নিশ্চিত করতে হবে।
 ৬. দলগুলোর কার্যক্রম পরিচালনার জন্য আচরণবিধি, আর্থিক নীতিমালা, জেডার নীতি ও শুদ্ধাচার নীতিমালা প্রণয়ন করতে হবে।
 ৭. দলের গঠনতন্ত্রে কমিটি গঠন ও নেতৃত্ব নির্বাচনের ক্ষেত্রে নিয়মিত ও নির্ধারিত সময়ভিত্তিক কাউন্সিল আয়োজন এবং প্রতিটি পর্যায়ের নেতৃত্ব নির্বাচন গোপন ভোটের মাধ্যমে করতে হবে।
 ৮. দলীয় প্রধানের পদসহ নেতৃত্বস্থানীয় পদে একই ব্যক্তি কতদিন দায়িত্ব পালন করতে পারবে তা সুনির্দিষ্ট করতে হবে।
 ৯. দলের নেতৃত্ব পর্যায়ে ও নির্বাচনে মনোনয়ন প্রদানে নারী ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করতে হবে।
 ১০. নেতৃত্ব নির্বাচন ও মনোনয়ন প্রদানের ক্ষেত্রে যোগ্যতা ও অযোগ্যতার শর্তাবলী সুস্পষ্ট করতে হবে।
 ১১. দলের শৃঙ্খলা ভঙ্গ, বিভিন্ন অপরাধমূলক কার্যক্রমে সম্পৃক্ত নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান করতে হবে।
 ১২. দলে অপরাধীদের অনুপ্রবেশ বন্ধ করতে প্রতিরোধমূলক যাচাই ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে হবে।

সংযুক্তি ১: তথ্যসূত্র

1. Ahmed, N. (2004). Aiding the Parliament of Bangladesh: Experience and Prospect. UNDP and the University of Dhaka.
2. Ahmed, S. (2004). Bangladesh: Past and present. APH Publishing Corporation.
3. Almond, G. A., & Coleman, J. S. (1960). The politics of the developing areas. Princeton, NJ: Princeton University Press.
4. Amundsen, I. (2007). Political corruption: An introduction to the issues. Bergen: Chr. Michelsen Institute.
5. Bangla Tribune. (2025). নিবন্ধনের জন্য ইসিতে ১৪৪ রাজনৈতিক দলের আবেদন [144 political parties applied to the EC for registration]. <https://www.banglatribune.com/national/904635/>
6. Bangladesh Election Commission. (2008). Political Party Registration Rules, 2008 (S.R.O. No. 251-Law/2008). Election Commission Secretariat.
7. Boucek, F. (2009). Rethinking factionalism: Typologies, intra-party dynamics and three faces of factionalism. *Party Politics*, 15(4), 455–485.
8. Boucek, F. (2009). Rethinking factionalism: Typologies, intra-party dynamics and three faces of factionalism. *Party Politics*, 15(4), 455–485.
9. Cross, W., & Katz, R. S. (2013). The Challenges of Intra-Party Democracy. Oxford University Press.
10. Dahl, R. A. (1971). Polyarchy: Participation and opposition. Yale University Press.
11. Devine, J. (2007). The politics of governance and poverty in Bangladesh. *Journal of International Development*, 19(3), 321–340.
12. Diamond, L. (1999). Developing democracy: Toward consolidation. Baltimore, MD: Johns Hopkins University Press.
13. Election Commission of Nepal. (n.d.). Registering a political party: Process guide. <https://election.gov.np/en/page/registering-a-political-party-process-guide>
14. Election Commission of Sri Lanka. (n.d.). How is a political party registered? https://elections.gov.lk/en/political_party/political_party_how_register_party_E.html
15. Erdmann, G. (2017). Transition, seeming political stability, and the risks of authoritarian reversal. *Democratization*, 24(6), 981–998.
16. European Union Election Observation Mission. (2009). Final Report: Parliamentary Elections, 29 December 2008.
17. Fisher, J. (2013). Party finance: A comparative perspective. In *The Funding of Political Parties: Where Now?* Political Studies Association.
18. Government of India. (1951). The Representation of the People Act, 1951 (Section 29A: Registration of political parties). <https://www.ceo.kerala.gov.in/ceokerala/backend/public/uploads/pdfs/representation-of-the-people-act-1951.pdf>
19. Government of the People's Republic of Bangladesh. (1972). The Constitution of the People's Republic of Bangladesh. Bangladesh Laws. <https://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-957.html>
20. Government of the People's Republic of Bangladesh. (1972). The Representation of the People Order, 1972 (President's Order No. 155 of 1972). Legislative and

Parliamentary Affairs Division.

https://asset.ecs.gov.bd/media/uploaded_files/notices/2026/01/Y2YjkqkgfwfMPM7ZO SPXDGoJvdQXmcWzXZdJXp78.pdf

21. Government of the People's Republic of Bangladesh. (1978). The Political Parties Ordinance, 1978 (Ordinance No. 45 of 1978). Legislative and Parliamentary Affairs Division. https://asset.ecs.gov.bd/media/uploaded_files/notices/2026/05/9e444af4-f8ae-4604-b231-de37d500aa0d.pdf
২২. মনিরুজ্জামান, মু. (২০২১)। বাংলাদেশের দলীয় রাজনীতি ও রাজনৈতিক সহিংসতার ৫০ বছর: প্রবণতা এবং কাঠামোর একটি বিশ্লেষণ। তারেক শামসুর রেহমান (সম্পা.), বাংলাদেশ রাজনীতির ৫০ বছর। শোভা প্রকাশ।
23. Hassan, M. (2014). Political settlement dynamics in a limited-access order: The case of Bangladesh.
24. Helmke, G., & Levitsky, S. (Eds.). (2006). Informal Institutions and Democracy: Lessons from Latin America. Johns Hopkins University Press. [wcfa.harvard.edu], [press.jhu.edu]
25. Hicken, A. (2015). Building party systems in developing democracies. Cambridge University Press.
26. Hicken, A. (2015). Party and Party System Institutionalization in the Developing World. In Routledge Handbook of Comparative Political Institutions.
27. Hickey, S. (2013). Thinking about the politics of inclusive development: Towards a relational approach (ESID Working Paper No. 1). Effective States and Inclusive Development Research Centre (ESID), University of Manchester.
28. Hossain, A. (2017). Patron-client politics and the state in Bangladesh. South Asia Research, 37(1), 1–19. <https://doi.org/10.1177/0262728016685280>
29. Hossain, A. (2024). Youth movements and political change in Bangladesh: From resistance to reform. South Asian Journal of Political Studies, 12(1), 45–68.
30. Human Rights Watch. (2024). World Report 2024: Bangladesh. New York: Human Rights Watch.
31. Huntington, S. P. (1968). Political order in changing societies. Yale University Press.
32. IDEA (International Institute for Democracy and Electoral Assistance). (2016). Political Party Organization and Management. <https://www.idea.int>
33. IFES. (2026). Solving the Puzzle: Political Party and Campaign Finance Transparency. Washington, DC. [ifes.org]
34. International Crisis Group. (2018). Bangladesh: The challenges of democratic consolidation. Asia Report No. 294
35. International Crisis Group. (2024). A New Era in Bangladesh? The First Hundred Days of Reform. Asia Report No. 344, 14 November 2024.
36. International Crisis Group. (2025). Bangladesh: The dilemmas of a democratic transition. Watch List 2025. [International Crisis Group](https://www.crisisgroup.org/)
37. International IDEA. (2014). Funding of Political Parties and Election Campaigns: A Handbook on Political Finance. Stockholm: International IDEA.
38. Jahan, R. (1980). Bangladesh Politics: Problems and Issues. Dhaka: University Press Limited.

39. Jahan, R. (2005). Bangladesh Politics: Problems and Issues. Dhaka: University Press Limited.
40. Jahan, R. (2005). Bangladesh politics: Problems and issues. Dhaka: University Press Limited.
41. Jahan, R. (2015). Political parties in Bangladesh. Dhaka: Prothoma Prokashan.
42. Kabir, M. H. (2006). Party Politics in Bangladesh: Issues, Trends and Future Prospects. In R. Ahmed (Ed.), Political Parties in South Asia. Dhaka: Friedrich-Ebert-Stiftung.
43. Katz, R. S., & Mair, P. (1995). Changing models of party organization and party democracy. *Party Politics*, 1(1), 5–28.
44. Khan, M. H. (2005). Markets, states and democracy: Patron–client networks and the case for democracy in developing countries. *Democratization*, 12(5), 704–724.
45. Khan, M. H. (2010). Political settlements and the governance of growth-enhancing institutions. Research Paper No. 14. London: SOAS.
46. Khan, M. H. (2013). The political settlement, growth and technical progress in Bangladesh (DIIS Working Paper No. 2013:01). Danish Institute for International Studies.
47. Khan, M. H. (2018). Political settlements and the analysis of institutions. *African Affairs*, 117(469), 636–655. <https://doi.org/10.1093/afraf/ady027>
48. Khan, M. M. (1989). The process of bureaucratization in Bangladesh. *Public Administration and Development*, 9(4), 397–412.
49. Khan, M. M. (2023). Governance, patronage politics, and challenges of internal democracy in Bangladesh. Dhaka: University Press Limited.
50. Kochanek, S. A. (2000). Patron-Client Politics and Business in Bangladesh. New Delhi: Sage Publications.
51. Krook, M. L. (2010). Quotas for Women in Politics: Gender and Candidate Selection Reform Worldwide. Oxford University Press.
52. Leftwich, A. (1996). Governance, democracy and development in the Third World. London: Macmillan.
53. Levitsky, S., & Way, L. A. (2010). Competitive authoritarianism: Hybrid regimes after the Cold War. Cambridge University Press.
54. Levitsky, S., & Ziblatt, D. (2018). How democracies die. New York: Crown Publishing.
55. Lewis, D. (2011). Bangladesh: Politics, economy and civil society. Cambridge: Cambridge University Press.
56. Lindberg, S. I. (2006). Democracy and elections in Africa. Johns Hopkins University Press.
৫৭. খান, আকবর আলি (২০২৩). অবাক বাংলাদেশ বিচিত্র ছলনাজালে রাজনীতি. প্রথমা প্রকাশন
58. Mainwaring, S., & Scully, T. (1995). Building Democratic Institutions: Party Systems in Latin America. Stanford University Press.

59. Mainwaring, S., & Scully, T. R. (1995). *Building democratic institutions: Party systems in Latin America*. Stanford University Press.
60. Maniruzzaman, T. (1980). *The Bangladesh Revolution and Its Aftermath*. Dhaka: Bangladesh Books International.
61. Michels, R. (1915). *Political Parties: A Sociological Study of the Oligarchical Tendencies of Modern Democracy*. Free Press.
62. Michels, R. (1915). *Political Parties: A Sociological Study of the Oligarchical Tendencies of Modern Democracy*. Free Press.
63. Mohan, G. (2024). How Bangladesh's student protest movement toppled Sheikh Hasina. *The Diplomat*. <https://thediplomat.com/2024/08/how-bangladeshs-student-protest-movement-toppled-sheikh-hasina/>
64. Muirhead, R., & Rosenblum, N. L. (2020). *A lot of people are saying: The new conspiracism and the assault on democracy*. Princeton, NJ: Princeton University Press.
65. Nassmacher, K.-H. (2009). *The Funding of Party Competition: Political Finance in 25 Democracies*. Nomos.
66. Norris, P. (2005). *Political Parties and Democracy in Theoretical and Practical Perspectives: Developments in Party Communications*. National Democratic Institute.
67. Norris, P. (2005). *Political Parties and Democracy in Theoretical and Practical Perspectives: Developments in Party Communications*. National Democratic Institute.
68. North, D. C., Wallis, J. J., & Weingast, B. R. (2009). *Violence and social orders: A conceptual framework for interpreting recorded human history*. Cambridge University Press.
69. O'Donnell, G. (1998). Horizontal Accountability in New Democracies. *Journal of Democracy*, 9(3), 112-126
70. Ohman, M. (2014). *Political party finance regulation: Lessons from global comparative experience*. IFES.
71. Ohman, M. (2014). *Political party finance regulation: Lessons from global comparative experience*. IFES.
72. Organization for Security and Co-operation in Europe/Office for Democratic Institutions and Human Rights (OSCE/ODIHR). (2011). *Guidelines on political party regulation*. Warsaw: OSCE/ODIHR.
73. Panebianco, A. (1988). *Political parties: Organization and power*. Cambridge University Press.
74. Pateman, C. (1970). *Participation and Democratic Theory*. Cambridge University Press.
75. Pye, L. W. (1965). *Aspects of political development*. Boston, MA: Little, Brown and Company.
76. Rahat, G., & Hazan, R. Y. (2001). Candidate selection methods: An analytical framework. *Party Politics*, 7(3), 297–322.
77. Rahat, G., & Hazan, R. Y. (2001). Candidate selection methods: An analytical framework. *Party Politics*, 7(3), 297–322.

78. Rahman, M. (2017). Political development in contemporary societies. Dhaka: University Press Limited.
79. Rahman, M. S. (2019). Politics, governance and development in Bangladesh. Routledge India.
80. Randall, V., & Svåsand, L. (2002). Party institutionalization in new democracies. *Party Politics*, 8(1), 5–29.
81. Riaz, A. (2004). *Unfolding State: The Transformation of Bangladesh*. Dhaka: The Press.
82. Riaz, A. (2016). *Bangladesh: A Political History Since Independence*. London: I.B. Tauris.
83. Riaz, A. (2019). *Voting in a Hybrid Regime: Explaining the 2018 Bangladeshi Election*. Singapore: Palgrave Macmillan.
84. Riaz, A. (2022) 'Bangladesh's quiet slide into autocracy', *Foreign Affairs*, 29 April. Available at: <https://www.foreignaffairs.com/articles/bangladesh/2022-04-29/bangladeshs-quiet-slide-autocracy> (Accessed: 3 May 2026).
85. Riaz, A. (2024). Political transition in Bangladesh may move the country away from a dark chapter, but risks of mass violence against civilians remain. United States Holocaust Memorial Museum, Simon-Skjodt Center for the Prevention of Genocide. <https://www.ushmm.org/genocide-prevention/blog/political-transition-in-bangladesh-may-move-country-away-from-dark-chapter>
86. Sartori, G. (1976). *Parties and party systems: A framework for analysis*. Cambridge University Press.
87. Saxena, A. (2022). India's eastern frontier and the geopolitics of Bangladesh. *Strategic Analysis*, 46(3), 211–230.
88. Scarrow, S. (2005). *Implementing Intra-Party Democracy*. National Democratic Institute.
89. Scarrow, S. E. (2015). *Beyond party members: Changing approaches to partisan mobilization*. Oxford University Press.
90. Schattschneider, E. E. (1942). *Party government*. New York: Rinehart.
91. Sobhan, R. (1993). *Bangladesh: Problems of Governance*. Dhaka: University Press Limited.
92. Suri, K. C. (2007). *Political parties in South Asia: The challenge of change*. Stockholm: International IDEA.
93. Suykens, B. (2018). The informal economy of political parties: Tender-snatching and extortion in Bangladesh. *Modern Asian Studies*, 52(4), 1210–1238.
94. The Daily Star. (2024). A new dawn rises on Bangladesh. <https://www.thedailystar.net/opinion/editorial/news/new-dawn-rises-bangladesh-3670546>
95. The Electoral Commission. (n.d.). Political party registration. <https://www.electoralcommission.org.uk/political-registration-and-regulation/political-party-registration>

96. Transparency International Bangladesh. (2024). দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন প্রক্রিয়া ট্র্যাকিং (চূড়ান্ত প্রতিবেদন) [Tracking the 12th parliamentary election process: Final report].
<https://www.ti-bangladesh.org/images/2024/report/ept/Full-Report-Election-Process-Tracking-bn.pdf?v=1.7>
97. Transparency International Bangladesh. (2026). Corruption Perceptions Index (CPI) 2025: Brochure. Transparency International Bangladesh. <https://ti-bangladesh.org/upload/files/2025/cpi/CPI2025-Brochure.pdf>
98. United Nations Development Programme. (2020). Women's political participation. <https://www.undp.org/governance/womens-political-participation>
99. van Biezen, I. (2003). Political parties in new democracies: Party organization in Southern and East-Central Europe. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
100. Venice Commission. (2014). Report on the role of political parties in democracy. Strasbourg: European Commission for Democracy through Law.